প্রকাশকাল .
মে—১৯৫৮

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫।২এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শরৎচন্দ্র গুহে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলকাতা-৯

প্রণব শূর

ফটো :
অভিজিত দাশগুপ্ত,
এক্সপ্লোরার্স ক্লাব ও
আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

দু' বছর আগে 'কানোজি আংরে' চড়ে আন্দামান পাড়ি দিয়েছিলেন দুই দুঃসাহসী তরুণ—ডিউক আর পিনাকী। এঁরা দু'জন সে সময় ছিলেন প্রতিদিন প্রথম পাতার খবর। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরের পিছনে ছিল তৃতীয় আর একজন 'অভিযাত্রী'র অদম্য উৎসাহ। তার নাম চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস,—খেলার জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'চিরঞ্জীব'। এই চিরঞ্জীবই ডিউক-পিনাকীকে ডায়মণ্ডহারবার ছাড়িয়ে মোহনা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে এবং আন্দামান গিয়ে যাত্রা শেষের অভ্যর্থনাও জানিয়েছে।

এই অভিযান যেমন ছিল অভিনব, তেমনি ছিল বিপদ-সঙ্কুল। ভেলার নাম যে মারাঠী নৌ-বীরের নামে, সেই 'কানোজি 'আংরে'র মত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন অভিযাত্রী যুগল!

চিরঞ্জীবের কলমে তাঁদের যাত্রা পথের ঘটনাবলী আরও রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে। পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আমিও যেন অভিযানে সহযাত্রী। সোনার নয়, চিরঞ্জীবের কলম ওই ভেলার বৈঠার মত আরও জোরদার হোক।

অমিতাভ চৌধুরী

এমনিভাবেই বোধহয় চিরকাল কিছু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। দু'চারজন পাগল মানুষের খেয়ালীপনা বা একগুঁয়েমীতে শুধু ইতিহাস নয়, রোমাঞ্চকর সব কাণ্ড সৃষ্টি হয়। শুরুতে এসব ব্যাপারে দোটানায় পড়ে মুষ্টিমেয় কেউ কেউ মদত দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু অন্তিম পর্বে দেখা যায় গোটা জাতিও পাগলামিতে গা ভাসিয়েছে।

সাঁতারু মিহির সেনের এমনি এক খামখেয়ালিতে সাড়া দিয়েছিল ডিউক ও পিনাকী। ব্যাপার কী? না, দাঁড় বেয়ে কলকাতা থেকে আন্দামান যেতে হবে 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে' নিয়ে। শুরু থেকে আমিও কী ভাবে রাজনৈতিক নেতাদের একঘেঁয়ে বক্তৃতা, দিনের পর দিন নানা ধরণের প্রেস কনফারেন্স, ভি, আই, পি,-দের ইণ্টারভ্যু আর খেলার মাঠ ছেড়ে ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম, সে কথায় পরে আসছি। আসলে আমি ছিলাম কালি ও কলম নিয়ে মদতদাতাদের দলে, এবং হয়তো এই দলের পুরোভাগে। তবুও বন্ধু ও আপনজনদের কাছে বদ্ধ পাগল বনে গেলাম। একবার ভেবেছিলাম ডিউক-পিনাকীদের সঙ্গ ত্যাগই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। বরং উল্টো রোখ চেপে গেল—দেখবো এবার জগৎটাকে। আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে রাশি রাশি চিঠি আসতে লাগলো—এইভাবে 'আত্মহত্যার কোনও মানে হয় না।' কিছু চিঠির উত্তর দিলাম,

কানোজি আংরে

এ আত্মহত্যা নয়। ডিউক-পিনাকী নিজের জীবন তুচ্ছ করে আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে। ইউলিসিসের গল্প তুলে ধরলাম। বললাম, কলম্বাস ভাস্কো-ডি-গামা কিংবদন্তী নন। বিজ্ঞানের বাহাদুরিতে মানুষ আজ পৃথিবী থেকে চাঁদে। তবুও বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! এইজন্যই থর হেইয়েরদাল ১৯৪৭ সালে কাঠের ভেলায় করে কন-টিকি অভিযানে গিয়েছিলেন (ইনিই ১৯৬৯ ও '৭০-এ প্যাপিরাসের নৌকোয় মিশর থেকে বারবাডোজ অভিযান করেন)। অ্যামাণ্ডসনের মেরু অভিযান, ছোট নৌকো 'ইংলিশ রোজ-৩' নিয়ে ক্যাপ্টেন জন রিজওয়ে ও সার্জেন্ট ব্লাইথের দুর্গম আটলান্টিক অভিযানের নজিরগুলিও আমার হাতের কাছে। এসবই সাগর পারের মানুষের সাগর বিজয়ের ঘটনা। তবুও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয় সেই বুড়ো মানুষ চিচেস্টারের দিকে। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে একাকী পাল তোলা নৌকো নিয়ে কেমন করে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড গেলেন ও ফিরলেন!

দুঃসাহসিকতার কাজ যে আমাদের দেশে—ভারতবর্ষে হয় না, তা নয়। ভারতীয়রা পিছিয়ে এমন কথাও বলা অনুচিত। তাহলে আমাদের দেশে তেনজিং হতেন না। মিহির সেনকে পেতাম না, ডিউক-পিনাকী দাঁড়ের নৌকো নিয়ে বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আন্দামানে পৌঁছতও না। বলা বাহুল্য এই অভিযানের পর বাংলা তথা ভারতের তরুণ-তরুণীদের মরা গাঙে ভরা জোয়ার এসেছে। ঝিমিয়ে পড়া এই যুব সমাজের মনের দেওয়ালে প্রথম দোলা দেন মিহির সেনই। একের পর এক সমুদ্র-বিজয় করেছেন সাঁতার কেটে। 'নিজে আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'—মিহির সেন সেকালের প্রবচনের একালের জলন্ত প্রমাণ এদেশে।

নৌকোয় আন্দামান অভিযানের পরিকল্পনাও তাঁরই। এই অভিযানের

তিনি নেপথ্য নায়ক। ১৯৫৮ সালে এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল একটিমাত্র উদ্দেশ্য: ভারতের তারুণ্যকে জাগ্রত করা। এল ১৯৬৬। মিহির সেন তখন নিজের সাঁতার অভিযানগুলি শেষ করেছেন।

আটান্নয় যে বীজ পুঁতেছিলেন, জলের অভাবে তার যেন নাভিঃশ্বাস উঠেছিল। বীজ তখন মরো মরো। সাতষট্টিতে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবকে নতুন করে গড়া হল। আটান্ন সালে ঠিক ছিল কন্-টিকি'র মত এটিও ভেলায় অভিযান হবে। পরে ভেলা বদলে দাঁড়টানা নৌকোর কথা ভাবা হয়। ওদিকে দাঁড়টানা নৌকোয় রিজওয়ে ও ব্লাইথ কিছুদিন আগে আটলান্টিক অভিযান শেষ করেছেন। ওদের লেখা বই 'ফাইটিং চান্স' পাওয়া গেল। এরপর চাই নৌকোর নক্সা। রিজওয়ে-ব্লাইথের 'ইংলিশ রোজ-৩' তৈরি করেন ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড বোট সার্ভিস।

'ইংলিশ রোজ-৩' ছাড়া গত একশ' বছরের মধ্যে এই ধরণের কোনো অভিযান হয় নি। তাও আবার ফণাহীন (?) আটলান্টিকে; গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বঙ্গোপসাগরে কখনও নয়। আটলান্টিকের উপসাগরীয় স্রোতের টানে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল থেকে কিছুটা সহজেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে পৌছান যায়। আর আন্দামানের পথে কেবলি ঘূর্ণিস্রোত। তার গতি সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী। নৌকোয় কলকাতা থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সহজে পৌছুতে গেলে এরই সুযোগ নিতে হবে। অভিজ্ঞতা থাকা চাই সদাবিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের এই ঘূর্ণিস্রোতের। তাই বলে আটলান্টিক ও বঙ্গোপসাগরকে নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। প্রথমটির 'হারিকেন' সম্পর্কে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব তেমনি বছরের নয় মাস বঙ্গোপসাগর আটলান্টিকের চাইতেও ভয়াবহ থাকে। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত সে কিছুটা শান্ত। কিছুটা নিস্তব্ধ। বা কিছুটা স্তিমিত।

তবুও বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন। যত বেশি ওয়াকিবহাল হওয়া যায় ততই নিরাপদ অভিযান। এক্ষেত্রে নৌবাহিনীর সাহায্য চাই সকলের আগে। পূর্ব উপকূলের ভারপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল কে, আর, নায়ারের স্মরণাপন্ন হলেন মিহির সেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০ সালে পাল তোলা নৌকোয় বিশখাপত্তনম থেকে আন্দামান তথা 'কালাপানি' অভিযানের বিবরণ পাঠিয়ে দিলেন। ওই বছর নৌবাহিনীর লেফটেনান্ট সামন্তের নেতৃত্বে প্রথম আন্দামান অভিধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

অ্যাডমিরাল এ, কে, চ্যাটার্জির নির্দেশে অপারেশন কম্যাণ্ডারের অধিকর্তা মহীন্দ্র বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরী করলেন। তার সঙ্গে যোগ করা হল 'এ ফাইটিং চান্স' কে।

কলকাতায় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হল। তাঁরাই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়ণের নেপথ্যে রইলেন। শুরুতে এই কমিটিতে ছিলেন মার্কেন্টাইল মেরিণের ক্যাপ্টেন ডি সুজা, কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের ক্যাপ্টেন পি, এন, বাটরা, কলকাতার নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কম্যাণ্ডার আর, পি, খান্না। যোগ দিলেন হুগলীর হারবার মাষ্টার ক্যাপ্টেন বি, এস, পাণ্ডরী। এ ছাড়া রইলেন এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের অমর চ্যাটার্জি, অশোক দাশগুপ্ত এবং থর মরুভূমি অভিযান-খ্যাত ক্লাবের সদস্য যুগভানু সিংদেও ওরফে জিমি। অমল ঘোষ আর অমিত রাহার কাজে রাত-দিনে কোন ফারাক ছিল না!

নৌকো তৈরি নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। কেমন নৌকো, কোথায়

তৈরি হবে ইত্যাদি। এজন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন হয় অনেক আগে। ১৯৬৮-র ২২শে জুন অ্যাডমিরাল চ্যাটার্জি কলকাতায় গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপে 'কিল' করলেন। ওখানকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস, সুন্দররাজন এবং এ, জে, ওয়াইজ পরম উৎসাহে এগিয়ে এলেন। যাত্রা শুরুর আগের দিন পর্যন্ত ওয়ার্কশপের কত কর্মী কেমন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন তা ভাবলে আজও অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, বাঙালী 'এখন কুঁড়ে।'

কেমন নৌকো

উপর খোলা নৌকোর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ সাড়ে পাঁচ ফুট। নৌকোর খোলে ৮০ গ্যালন পানীয় জল রাখার মত ব্যবস্থা। খালি অবস্থায় জল থেকে উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট; তবে প্রায় এক টন অতি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিলে জল থেকে উচ্চতা দাঁড়ায় মাত্র ১৪ ইঞ্চি। সি, পি, টিকের তৈরী আন্দামান অভিযানের জন্য এই নৌকোয় তিন জোড়া দাঁড়ের ব্যবস্থা হল। এছাড়া অতিরিক্ত চাই কয়েক জোড়া। কেন না, অকুল দরিয়ায় কোন্ বিপদ আসবে কে জানে!

নৌকোর মধ্যে তিনটি ছয় ইঞ্চির ছোট বেঞ্চের মত বসার জায়গা বানানো হল। অভিযাত্রিগণ ওর উপরেই বসবে, বিশ্রাম নেবে, ঘুমোবে। উপরন্তু দাঁড়ও টানবে ওখানে বসেই। গলুইয়ের দিকে রাডার বসানো হল। নদীর মধ্যে থাকার সময় বা আন্দামানের দিকে গিয়ে অগভীর উপকূলে রাডারের প্রয়োজন বলে। নৌকোয়

কোনও কেবিন নেই। রোদে পোড়া থেকে বাঁচার জন্য ক্যানভাসের চাঁদোয়া ব্যবহার করবে অভিযাত্রীদ্বয়। অবশ্য চাঁদোয়া মাথায় দিয়ে দাঁড় বাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ সাগরের বুকে সব রকম কষ্ট সহ্য করার জন্য দুটি প্রাণীকে সঁপে দেওয়া হবে!

ইঞ্জিনবিহীন নৌকোয় পালও নেই। দাঁড়ের নৌকোকে একমাত্র সহযোগিতা করবে সমুদ্রের অনুকূল স্রোত। তাই অভিযাত্রী নির্বাচন শুধু তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা বা সুস্বাস্থ্য দেখে নেয়—অপরিহার্য হল তাদের তাৎক্ষণিক বিচারবুদ্ধি এবং তদনুযায়ী কাজ করা।

আট ফুট উঁচু মাস্তুলের মাথায় ব্রোঞ্জ 'ক্রাউন' তৈরি হল। ওটির কাজ রাডার রিফ্লেক্টরের। রাডারের উপরে ব্যাটারী-চালিত আলোর ব্যবস্থা হল—অন্ধকার সমুদ্রে যখন অভিযাত্রীদ্বয় ঘুমুবে তখন কোন জাহাজ যাতে ওদের ঘাড়ে চেপে বিপদ না ঘটায় তাই। স্থির হল নৌকোয় কেরোসিন, পেট্রল বা কোনরকম দাহ্য পদার্থ থাকবে না। তবে শেষে স্থির হয় দাঁড় থাকবে সাকুল্যে ছয় জোড়া।

নৌকোটি এমনভাবে তৈরি করা হল যে মালপত্রে ভর্তি থাকা সত্ত্বেও যদি ঢেউয়ে পড়ে ডুবে যায় তাতে খুব আশংকার কারণ থাকবে না। সামান্য ছোঁয়াতেই আবার তাকে যথারীতি অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে। হুগলীতে ডিউক-পিনাকীব ট্রেনিংকালে তার প্রমাণও পেলাম।

সেদিন ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬৯। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী এল, এন, মিশ্র কলকাতায় এসে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌকোখানি এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের হাতে তুলে দিলেন। তখনও ওর নামকরণ হয়নি।

ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেনের মাথায় তখন আর এক চিন্তা৷

ভাবনা নামকরণ নিয়ে। ঐতিহাসিক নাম চাই। এমন নাম ভারত-ইতিহাসে যা অবিস্মরণীয় এবং গরীয়ান করে তুলবে আর এক ইতিহাস—প্রথম দাঁড়টানা নৌকোয় আন্দামান অভিযানকে। সেই নাম, সমুদ্রেও যার একাধিপত্য ছিল।

নামে কিবা আসে যায় তবুও মিহিরবাবু বললেন, কোনও সময় আমরা নিছক অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এই অভিযানের কথা ভাবিনি। এই অভিযান এমনভাবে সমগ্র জাতিকে নাড়া দেবে যাতে ভাঁটা পড়া বাংলা তথা ভারতের তারুণ্যে জোয়ার আসবে। তাই সাধারণ নাম নয়। এমন নাম চাই যার মধ্যে কাহিনী আছে, কিংবদন্তী আছে, যা মানুষকে উৎসাহিত করবে, প্রেরণা দেবে। সেই নামটি হল মৃত্যুঞ্জয়ী মারাঠা নাবিক 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—নামটি উত্থাপিত হতে কেউ কোনরকম উৎসাহ দেখালেন না। কানোজি আংরে? সে আবার কে!—এই রকম মনোভাব।

অথচ আড়াই শ' বছর আগে টুকোজি আংরে'র (শিবাজীর নৌবাহিনীর কম্যাণ্ডার) ছেলে কনোজি দুর্দান্ত বিদেশী কয়েকটি নৌবাহিনীর সঙ্গে একাকী লড়েছিলেন। পরাস্ত করেছিলেন পর্তুগাল, হল্যাণ্ড ও গ্রেট ব্রিটেনের সম্মিলিত বাহিনীকে। ইউরোপের কাছে কানোজি মাথা নত করেন নি। এই কানোজিই ১৭১৩ সালে বোম্বাইয়ের ইংরেজ গভর্ণরের নৌকো আটক করে রেখেছিলেন। ১৭২৯ সালে তিনি মারা যান।

আন্দামান গামী এই ছোট্ট নৌকোর গায়ে ইংরেজিতে লেখা হল 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে'।

নৌকোর সমস্যা মিটল। এবার অন্যান্য জিনিষ চাই। টাকা কোথায়! আলো থেকে আবার অন্ধকারে! এক মাসের এত বড় অভিযানে অনেক কিছু চাই। অ্যাডভেঞ্চারের সব 'থ্রিল' বুঝি মাঝপথে

বিলীন হয়ে যায়। আর্থিক বিস্ময় নিয়ে বহু আগেই ভাবা হয়েছিল, ক্লাবের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা তদনুযায়ী কাজও করেছেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়েছে সামান্যই। অথচ উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের সাহায্য চাই। তবে এক কপর্দক সরকারী সাহায্য নয়। সরকারী সাহায্য ছাড়া কোন কাজ করা যায় না—প্রচলিত এই ধারণাকেও এক্সপ্লোরার্স ক্লাব চ্যালেঞ্জ জানালেন।

অথচ কলকাতায় আচার্য জগদীশ বসু রোডে কারনানি এস্টেটে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের তখন অফিস ঘরের চার মাসের ভাড়া বাকী। এদিকে অভিযানের জন্য চাই অন্যূ আড়াই লক্ষ টাকা। এর আগে াব স্যুভেনির ছেপে বিজ্ঞাপন থেকে মাত্র সাত হাজার টাকা তুলেছে। অর্থাৎ অভিযান শুরুর আগেও নানা অভিযান করতে হল চেয়ারম্যান থেকে সাধারণ সদস্য পর্যন্ত প্রায় সকলকেই।

কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ—সর্বত্র বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে চিঠি দেওয়া হল সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। কিন্তু উত্তর আসে মাত্র দুটি। তাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাইভেট অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাছ থেকে। তারপর চিঠি গেল বিভিন্ন বণিক সমিতির কাছে। মিলল মাত্র ৬২৫ টাকা। আবার স্যুভেনির ছাপা হল। উঠল দশ হাজার টাকা।

তবে সাহায্য করেছেন অসংখ্য মানুষ, সহানুভূতি জানিয়েছেন কতজন তারও শেষ নেই। এবং তাদের জন্যই 'কানোজি আংরে' যাত্রা করতে পেরেছিল।

নৌকোয় কি কি খাদ্য থাকবে—সে নিয়ে আবার সমস্যা। ইংল্যাণ্ডের অভিযানে 'টিন্‌ড রাইস ও বিফ কারি' বেশি ব্যবহৃত হয়েছিল। সব খাদ্য ও পানীয় তারা কিনেছিলেন। কিন্তু ভারতে? ওই ধরণের খুব কম জিনিষই মেলে। যাও বা পাওয়া যায় তা ছোট ছোট টিনে। ত্রিশ দিনের জন্য দুই জনের খাদ্য চাই।

খাদ্য পাওয়া গেল প্রতিরক্ষা সচিব এইচ, সি, সারিণের বদান্ততায়। কিন্তু ওর সব নিয়ে যেতে হল মহীশূরে পরীক্ষার জন্য—ডিফেন্স ফুড রিসার্চ ল্যাবোরেটরিতে। সেখানকার ডিরেক্টর ডাঃ বিজয় রাঘবন বললেন, অভিযাত্রীদের যে কোন একজনকে মহীশূরে আসতে হবে। তাদের কোন্‌টা খেতে কেমন লাগবে তদনুযায়ী খাদ্য পছন্দ করতে হবে এবং তিনিই খাদ্য সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। এ উনসত্তরের জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের কথা। তখনও ঠিক রয়েছে যাত্রা শুরু হবে ২৫শে জানুয়ারী।

ডিউককে তাই বিমানে মহীশূর পাঠান হল। অথচ পকেট প্রায় শূন্য! রাজ্যপাল ধর্মবীরের দ্বারস্থ হলেন মিহিরবাবু। তিনি আই, এ, সি-র চেয়ারমানকে জানাতেই সব ব্যবস্থা হল। ডিউক মহীশূরে পরীক্ষার পর পাঁচ শ' কিলো 'টিন-ফুড' নিয়ে ফিরে এল।

উপদেষ্টা কমিটির বিশেষজ্ঞরা তাঁদের কাজ যথারীতি করছেন। যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি শেষ, রুটম্যাপ অর্থাৎ কোন্ পথে যাবে এবং অন্যান্য বিষয়ও প্রস্তুত।

অভিযান শুরুর উপযুক্ত সময় কখন! কলকাতা আবহাওয়া অফিসের প্রধান রাই সরকার ও তাঁর সহযোগীদের সাহায্য চাওয়া হল। পি ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে আন্দামানের পথে বঙ্গোপসাগরের একশ' বছরের চরিত্র কি ছিল তা জানিয়ে দিলেন। তারপরই উপদেষ্টা পর্ষৎ স্থির করলেন অভিযান জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে শেষ করতেই হবে।

অবশ্য যাত্রাপথে পুরো তিন দিন অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টা বর্মা উপকূলে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। ডিউক-পিনাকী তখন চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। পরে ওদের ডায়েরী এবং আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট থেকে জানতে পারি গৌহাটি ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল এবং তাই সমুদ্রেও তোলপাড়।

অন্যরকম ব্যবস্থাও অভিযাত্রীদের ছিল। ওই রকম বিপদ এলে, আংরে ডুবে গেলেও ডিউক-পিনাকী সপ্তাহের পর সপ্তাহ অকূল সমুদ্রে ভেসে থাকতে পারবে। বেলুন ভ্রাইয়েল সংযুক্ত বিমানবাহিনীর জরুরী-কালীন বেতার প্রেরকযন্ত্র সঙ্গে রইল, দুটি লাইফ জ্যাকেট; বিশেষ ধরণের কিছু খাদ্য, বিশেষ ধরণের দেশলাই, সিগন্যাল টর্চ, ভেরের পিস্তল। এই পিস্তল থেকে এমন ধরণের রঙিন আলো বের হবে যে, তা দেখে দূরের জাহাজ এমনকী বিমানও সংকেত বুঝে বিপদের সময় সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে। এছাড়া ছিল মাছ ধরার ছিপ, সমুদ্রের নোনা জল থেকে নুন আলাদা করে তা পানীয়রূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (এগুলি দেন পুনের ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবোরেটরী)। হাঙর তাড়াবার জন্য পাউডার, ওষুধ, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ অন্য সব সরঞ্জাম পৃথকভাবে ওয়াটার প্রুফ পাত্রে নৌকোর খোলে বেঁধে দেওয়া হয়।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাবকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেনকে। কেননা, জরুরীকালীন ওইসব সরঞ্জাম ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে না থাকলে আমরা হয়তো ভারতের এই দুই তরুণ দুঃসাহসীকে আর কোনওদিন খুঁজে পেতাম না। যেমন অসংখ্য অভিযাত্রী হারিয়েছেন হিমালয়ে বা অন্যান্য পর্বতে, তেমনি এরাও হারিয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের নীল জলে।

মাঝ দরিয়ায় 'কানোজি আংরে' এবং 'ডিউক-পিনাকীর' হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা পরে বলছি। কিন্তু তার 'আগে' বলে রাখি—ওদের এপারে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে কলকাতায় ফিরে শুনি নানা মহলে নানা সমালোচনা। এমন কি নৌবাহিনী, সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও বলছেন—এভাবে মৃত্যুর মুখে দুটি তরুণকে এগিয়ে দেওয়ার মানে কী? কেন তাদের ৫০০ মাইল রেঞ্জের ওয়ারলেস দেওয়া হয় নি? উত্তরও সহজ: বড় ওয়ারলেস দিলে নৌকোর

কোনরকম মানসিক বৈকল্য যাতে না আসে তাই পাঁচদিন ধরে আদ্যোপান্ত খুঁটিনাটি পরীক্ষা হল প্রত্যেক অভিযাত্রী প্রার্থীর।
সবশেষে যোগ্য বিবেচিত হয় ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেনাণ্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার গবেষক পিনাকী চ্যাটার্জী।
পিনাকীর শরীর ও মনের পরীক্ষা হল। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় সে এ-১ শ্রেণীভুক্ত। ডিউককে একরকম ওয়াকওভারই দেওয়া হয়। তবে দিল্লী থেকে আগত মার্চেন্ট নেভির রমেশ সায়গল ও কলকাতার পিনাকী চ্যাটার্জী দুজনই সমান নম্বর পায়। কিন্তু সায়গলের মেডিকেল রিপোর্ট বলে দিল সে আপাতত 'আনফিট'।
১৯৬৯-এর ২১শে ডিসেম্বর দুই অভিযাত্রীর নাম ঘোষণা করা হল। আজ স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই আমি সেদিন বিকাল পর্যন্ত এই অভিযানকে তেমন গুরুত্ব দিই নি। তবে সন্ধ্যায় অগ্রজ প্রতিম ও নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সহযাত্রী সাংবাদিক গৌরদা' (গৌরকিশোর ঘোষ) বললেন, হেলা-ফেলা করিস নে। মিহির সেনের ব্যাপার। উনি যা ধরেন তা করেন।
তারপরই মিহিরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ও পরে পিনাকীর সঙ্গে।

প্রথমদিন : ডিউক পিনাকী ও আমি

টেলিফোনে কথা হচ্ছিল। অপর প্রান্ত থেকে অনুরোধ এল 'কাল সকালে গার্ডেনরীচে মেরিন ক্লাবে আসুন, আমি থাকব, জর্জ ডিউকও থাকবেন।'

২১শে ডিসেম্বর সকালে—প্রায় সাড়ে ছটায় হাজির হলাম মেরিন ক্লাবে।

কে পিনাকী, কে ডিউক তখনও জানি না। ট্রাউজার, সার্ট ও মোটা লেন্সের চশমা পরা একটি তরুণকে দেখে মনে হল সেই-ই পিনাকী। মেরিন ক্লাবে ডিউকের ঘরে ঢুকেই ওকে দেখে বুঝতে দেরি হয়নি। আর একজন খুব ফর্সা, স্যুট-টাই পরে ওরই সঙ্গে আলোচনা করছে। বুঝতে অসুবিধা হল না—এই ডিউক।

পিনাকী পরিচয় করিয়ে দিল—লেফটেনান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক।

ডিউক সেকহ্যাণ্ড করে জানাল, ওরা আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিল।

ব্রেকফাষ্টের পর তিনজন লনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—তোমাদের দুজনের পরিচয় কতদিনের?

পিনাকী ঘড়ি দেখে বলল, মাত্র পনের ঘণ্টা। গতকাল বিকাল চারটায় ডিউকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছে, আন্দামান অভিযান বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে হাজির হওয়ার পর। সাত শ' আবেদন পত্র এসেছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটি আমাদের দুজনকে নির্বাচন করেছেন।

ডিউক বলল, হয়তো দুজনকে সাগরজলে একসঙ্গে মরতে হবে।

পিনাকীর মুখের দিকে তাকালাম, কোন পরিবর্তন নেই। ডান হাত বজ্রমুষ্টি করে 'বে অফ বেঙ্গল পার হবোই।' সে ডিউকের দিকে তাকিয়ে 'তুমি লিডার, নৌবাহিনীর অফিসার এখনই মরার কথা বলছ যে!' পিনাকী নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার আবৃত্তি করে শোনাল, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু।' তারপর ইংরেজিতে তর্জমা করল। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও সঙ্গে। প্রায় বাইশ বছরের তরুণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার গবেষক আর পঁচিশ বছরের নৌ-বাহিনীর অফিসারে শুধু পরামর্শ, নানা জল্পনা, নানা ফন্দী।

শুনলাম বঙ্গোপসাগরের থল জল ডিউকের নখদর্পণে। একুশবার সে নৌ-বাহিনীর জাহাজ নিয়ে কলকাতা-আন্দামানের মধ্যে

যাতায়াত করেছে। ৬৭তে মন্ট্রিলের এক্সপো-য় সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বাবা, মা, ভাই বিদেশে—কানাডায়। দেশে তখন নিজের বলতে প্রেমিকা কোমল সচদেব। থাকেন বোম্বাইয়ে। পিনাকীর অভিজ্ঞতা আছে রোয়িংএ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং টিমের নেতৃত্ব করেছে। সে ইউনিভারসিটি ব্লু। বিদেশে বাইচের অভিজ্ঞতা আছে। তারই নেতৃত্বে কলকাতা একাধিকবার বিজয়ী হয়েছে।

সেদিন ক্লাব থেকে ফিরে আসার সময় পিনাকী হেসে বলল, চিরদাজীবদা, মরলেই বা কী! ডিউকের প্রেমিকা আছে। ওরা সায়েব-সুবো মানুষ, বাবা-মা'র তোয়াক্কা রাখে না। আমার কিন্তু বাবা মা বড় বাধা। কারুর মত নেই, ভাই বোন এমন কি বাড়ির চাকরটাও বলেছে—দাদাবাবু যেতে পারবেন না। কিন্তু আমি 'যাবোই, আমি যাবো।' দেখাতে চাই বাঙালী ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়, ভাল কাজের জন্য মরতে জানে।

বিকালে আবার দেখা। ওরা দুজনেই আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে এসেছিল। 'মাঠ-ময়দান' দফতরে ওদের দুজনের ছবি তোলা হল। তারপর দুজনেই বের হল। সময় অল্প, হাতে কাজ অনেক। পিনাকী বলল, মূলে মিহিরদা (সেন) থাকলেও নিজেদের সব দেখে শুনে নেওয়া দরকার। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নেওয়া তো আছেই। কিন্তু আরও জরুরী রিহারসাল। 'কানোজি আংরে' নিয়ে ওরা সাগর মোহনায় গিয়ে কয়েকদিন মহড়া দেবে। সমুদ্রের ঢেউ, হাওয়ার সঙ্গে ডিউক পরিচিত, কিন্তু ২০ ফুট×৫ ফুট দাঁড় টানা নৌকো নিয়ে অভিজ্ঞতা এই প্রথম। পিনাকীর তো নদী বা সাগরের অভিজ্ঞতাই নেই। শুধু লেকে বা ওই রকম বাঁধা জলে রো বোট চালিয়েছে। হ্যাঁ, তবে সমুদ্রকে দেখেছে দূর থেকে অনেক অনেকবার। অলক্ষ্যে নাকি সমুদ্র ওঁকে হাতছানি দিত। ডাক দিত তাকে জয় করার, কিন্তু সুযোগ কোনদিন আসেনি।

কানোজি আংরে

খবরের কাগজে এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞপ্তি দেখে সাড়া দিল; উপেক্ষা করতে পারেনি সপ্তসিন্ধু বিজয়ী মিহির সেনের তরুণের প্রতি আহ্বানকে। আর সাড়া দিয়েছিল মহীশূরের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অফিসার এই ডিউক।

সদস্য নির্বাচনের পরেই তোড়জোড় শুরু ট্রেনিং এর। এই ট্রেনিং-এর মধ্যে শারীরিক যোগ্যতা বাড়াবার জন্য রোজ ব্যায়াম, 'কানোজি আংরে' নিয়ে দাঁড় বাওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা, বেতারে সংবাদ আদান প্রদান, নৌকো মেরামতী বা ছুতোরের কাজ, এবং বিশেষ করে পিনাকীর জন্য নৌচালনা ও সিগন্যালিং-এ শিক্ষাদান; সর্বোপরি সমুদ্রের সঙ্গে আত্মস্থ হওয়া।

ক্যাপ্টেন পাভরি বললেন, পিনাকীকে সমুদ্রে যেতে হবে অভিযানের আগে, সাগর মোহনা পার হয়ে নৌকো নিয়ে দাঁড় টেনে টেনে অভ্যস্থ হোক; সীম্যানশিপ ও নেভিগেশনে ওকে পোক্ত হতে হবে। দুই দফায় পিনাকীকে মোহনায় (স্যাণ্ডহেডস) পাঠান হল। দ্বিতীয়-বার ডিউকও পিনাকীর সঙ্গী ছিল। শেষবার উভয়ে সমুদ্রের কিছু চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরে। ওদের সঙ্গে আমারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে তখন অন্তবর্তী সাধারণ নির্বাচনের দামামা বাজছে। ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া সম্ভব হয়নি। ডিউক পিনাকীর সঙ্গে একমাত্র সাংবাদিক ছিল স্টেটসম্যানের মানস ঘোষ।

ওদের ফেরবার পর মানসের মুখে খবর শুনে আশংকা হল: অভিযান হবে তো! কেননা, ডিউকের উরুর পেশিতে এমন টান ধরে যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল, পিনাকীর ডান হাতে বুড়ো আঙুলের নখ উড়ে গিয়েছে, শীতের সমুদ্রে ও ঝড়ে পড়েই নৌকোটাকে বাগে আনতে গিয়ে। ফেরার পর পিনাকীর আঙুলটা দেখে ভয় হল। ভয় আমার চাইতে মিহিরদা'র আরও বেশি এবং

তা ডিউককে নিয়েই ; একদিন রাজভবনের পূবদিকে গভর্ণমেণ্ট প্রেস ইষ্টে ওঁর অফিসে যেতেই ভ্রূ-কুঁচকে গম্ভীরভাবে বললেন, চিরঞ্জীব, ডিউককে বাদ দিতে হতে পারে। বললাম, তা হয় না। লিডারকে বাদ দিয়ে······? এমন অভিজ্ঞ ছেলে পাবেন কোথায় ?

মিহিরদা আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। হয়তো উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি হাসপাতালে খোঁজ নিলেন, ডাক্তারবাবু জানালেন, ডিউক এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। ওঁর মুখে তখন হাসি। আমি চলে এলাম।

অফিসে ফিরে শুনি মানস খবর পাঠিয়েছে—বিকালে আমি যেন 'ম্যান ও' ওয়ার জেটিতে থাকি। পিনাকীও যাবে। ইতিমধ্যে টেলিফোন এল মানসের 'তুমি অফিসের সামনে গেটে অপেক্ষা কর, আমরা আসছি।' মানস মোহনায় ডিউক পিনাকীর অসংখ্য ছবি তুলছে, ওর কাগজের জন্য বড় একটা রাইট-আপ লিখছে।

যেতে যেতে সে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল দূরের মোহনার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। ডিউক পিনাকী সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্র স্রোতে দাঁড় বেয়েছিল। সাগরের বুকে অতটুকু নৌকোকে দেখে বিদেশী জাহাজগুলির কৌতুহল এবং পোর্ট কমিশনার্সের পাইলট্ জাহাজকে জিজ্ঞাসা এবং তাঁদের লক্ষ্যের কথা শুনে অভিনন্দন ও খাবার পাঠানোর গল্প বলল মানস। ওরা নৌকোতেই টিনের খাবার ও স্টোভ নিয়ে গিয়েছিল। ট্রেনিং-এর সময়েই নৌকোতেই খাবার গরম করে খেতে শুরু করে।

জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে ওই ট্রেনিং শুরুর সময় ওরা দেখতে পায় বঙ্গোপসাগর পুকুরের মতই শান্ত, অচঞ্চল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে বঙ্গোপসাগর যে রূপ ধারণ করতে পারে তা দেখে সমুদ্রে নতুন হলেও পিনাকী ভয় পায়নি—অবশ্য মানসের মনে ভয় দেখা দিয়েছিল। সমুদ্র স্রোত এবং ঢেউয়ে নৌকো চলে গিয়েছিল পাইলট্ জাহাজের

নাগালের বাইরে। এদিকে 'আংরে'তে তখন কোনও কম্পাস ছিল না; বেতার ব্যবস্থাও নয়! একদিন বেলা একটার পর হঠাৎ সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে এবং তার পর এত দূরে 'আংরে' চলে যায় যে, পাইলট জাহাজ 'সাগর' এর কাছে ফিরতে তার রাত দশটা বেজে যায়।

মানস ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল নৌকোর চারিদিকে সমুদ্র সাপের কিল-বিল করে ঘুরে বেড়ানো আর ১২ থেকে ১৫ ফুট অসংখ্য হাঙরের আনাগোনা দেখে। তবে ওরা সব পালিয়ে যায় হঠাৎ শুশুকের 'হুশ' শব্দে। মানস ২৯শে জানুয়ারির ('৬৯) স্টেটসম্যানে ও সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিখেছিল। অভিযান সুরুর আগে ডিউক-পিনাকী সম্পর্কে এটি হল দ্বিতীয় বড় 'রাইট আপ'। প্রথমটি লিখেছিলাম আমি আনন্দবাজার পত্রিকায়

'নৌকোয় হাজার মাইল' হেডিং-এ ২৫শে ডিসেম্বর ('৬৮) তারিখে বের হয়:

ভারতের ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ সঞ্চারই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

নৌকোয় কলকাতা থেকে আন্দামান যাত্রা প্রসঙ্গে দুই সদস্যবিশিষ্ট অভিযাত্রী দলের নেতা লেফটেনাণ্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক গত শনিবার কথাগুলো বললেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার লেঃ ডিউক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার গবেষক পিনাকীরঞ্জন চ্যাটার্জি ২রা ফেব্রুয়ারি এই দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রা করবেন। পাল ও যন্ত্রবিহীন নৌকোয় দাঁড় টেনে আন্দামান পর্যন্ত হাজার মাইল যেতে লাগবে আনুমানিক চল্লিশ দিন। এশিয়ায় এই ধরণের অভিযান ইতিপূর্বে হয়নি। এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া এর উদ্যোক্তা। ৫০০ পাউণ্ড ওজনের নৌকোটি তৈরি হচ্ছে গার্ডেন রীচ ওয়ার্কশপে। নৌকোটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ২০ ও ৫ ফুট।

দুইজনের খাবার, বেতারযন্ত্র, ক্যামেরা, আর্গোমিটার কম্পাস ইত্যাদি

যন্ত্রপাতিসহ মোট ওজন দাঁড়াবে এক হাজার পাউণ্ড। অভিযানের ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা।

কলকাতার ম্যান ও' ওয়ার জেটি থেকে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের স্টিমার সঙ্গে থাকবে। তারপর বিপদসংকুল পথের একমাত্র ভরসা ম্যাপ, কম্পাস ও দিনের বেলায় সূর্য, রাত্রে চাঁদ তারা। ত্রিশ ও চল্লিশ ফুট উঁচু ঢেউ সম্পর্কে উভয়ে সচেতন। নৌকোর সঙ্গে উভয়ের কোমরে নাইলনের বেল্ট বাঁধা থাকবে। ডিউক গত বছর 'গুলদার' জাহাজে আন্দামান অঞ্চলে অপারেটিং-এ ছিলেন। ওই অঞ্চলে সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। পিনাকী ১৯৬৪-৬৫ ও '৬৫-৬৬ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং অধিনায়ক ছিলেন। লেক ক্লাবের হয়ে একবার কলম্বোও যান

ডিউকের বাড়ি দিল্লি। বয়স ২৫, বাবা, মা বিদেশে থাকলেও ছেলের এই ধরণের কাজে তাঁরা সর্বদাই উৎসাহ দেন, তরুণ নৌ অফিসারের নেশা ছবি তোলা ও কবিতা লেখা, সব কবিতাই প্রকৃতি ও সমুদ্রকে নিয়ে। বাকি বিষয়টি 'যুদ্ধ ও শান্তি'। পিনাকীর বয়স ২২। নিয়মিত লেখেন। অন্য নেশা গাড়ি চালানো। অভিযানের সময় শরীরের বিভিন্ন অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এজন্যও কিছু যন্ত্র নিয়ে যাবেন। ডিউক ফর্সা, লম্বায় ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, পিনাকীর রং ময়লা, ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতা। দুজনই অবিবাহিত। উভয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাক্তারী রিপোর্টে বলা হয়েছে—'এ-১'।

২রা জানুয়ারি থেকে কলকাতায় এক মাস দুজন ট্রেনিং নেবেন। তারপর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু।

এগিয়ে এলেন। ব্যারিস্টার এস. পি. সেন। সাদা দাড়ির খ্যাতি তাঁর আছে, ওঁর সঙ্গে মদৎ মিলল পোর্ট কমিশনার্সের ক্যাপ্টেন সাংবাদিক কৌতুক-পিপাসীকে এক সপ্তাহ দাঁড় টানায় তালিম দিলেন। ট্রেনিং-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দুই অভিযাত্রীর বসবাস। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত একের সঙ্গে অন্যের বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা, নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত কেউ কাউকে চিনতো না।

অভিযাত্রী মাত্র দুইজন। সংকুলান কিন্তু তারা জানেন যে হাজার সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

নৌকায় পিস্তল বা বন্দুক, তাছাড়া হুইস্কি নেওয়া হবে কিনা। বিশেষজ্ঞরা বন্দুক পিস্তলের প্রস্তাব তক্ষুনি নাকচ করলেন। হাঙ্গর নৌকোয় উঠতে পারে না। আমাদের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছালে অসভ্য হিংস্র জারওয়ারা আক্রমণ করতে পারে—এ আশংকাও সেকেলে ধারণা। তবে মাঝ দরিয়ায় দুই অভিযাত্রীতে যদি কোন কারণে প্রচণ্ড রকমের মত পার্থক্য দেখা দেয় তা হলে বন্দুক পিস্তল অঘটন ঘটাতে পারে। কিংবা যদি চরম কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে? হয়তো আত্মহত্যার কথা মনে হবে। হাঙ্গর বা জারওয়াদের কথা। তখন সমুদ্রের ঢেউয়ে বিলীন হয়ে যাবে। হুইস্কির, মানসিক অবসাদ স্খালনের জন্য সামান্য ব্র্যাণ্ডির অনুমতি দেওয়া হল এই জন্য যে, হুইস্কি অবসাদ না কমিয়ে অবসাদ আরও বাড়িয়ে তুলবে।

দাবা বা তাস (কিংবা এই ধরণের কোন খেলা) ঝগড়া বাধিয়ে দিলে কে তার মীমাংসা করবে? সম্প্রতি রাশিয়ায় মহাকাশ গবেষকরাও এর বিরোধিতা করেছেন, দাবা খেলা মানুষকে পৃথিবীর সব চিন্তা থেকে পৃথক করে রাখে। কিন্তু এও দ্বন্দ্ব ও হিংসার দিকে নিয়ে যেতে পারে। 'আংরে' যদি ডুবতে থাকে সেই সমূহ বিপদ থকে আত্মরক্ষার সব-

যেকম ব্যবস্থা ও অভিযাত্রীদের ছিল। ওই রকম বিপদ এলে, আংরে ডুবে গেলেও ডিউক-পিনাকী সপ্তাহের পর সপ্তাহ অকূল সমুদ্রে ভেসে থাকতে পারবে। বেলুন, ব্রিয়েল সংযুক্ত বিমানবাহিনীর জরুরী-কালীন বেতার প্রেরকযন্ত্র 'সার্বে', দুটি লাইফ জ্যাকেট, বিশেষ ধরণের কিছু খাদ্য, বিশেষ ধরণের দেশলাই, সিগন্যাল টর্চ, ভেরের পিস্তল (এই পিস্তল থেকে এমন ধরণের রঙিন আলো বের হবে যে, তা দেখে দূরের জাহাজ এমন কী বিমানও সংকেত বুঝে বিপদের সময় সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে)। এছাড়া ছিল মাছ ধরার ছিপ, সমুদ্রের নোনা জল থেকে নুন আলাদা করে তা পানীয়রূপে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (এগুলি দেন যোধপুরের ডিফেন্স রিসার্চ ল্যাবোরেটরী)। হাঙর তাড়াবার জন্য পাউডার, ওষুধ, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ অন্য সব সরঞ্জাম পৃথকভাবে ওয়াটার প্রুফ পাত্রে নৌকোর খোলে বেঁধে দেওয়া হয়।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাবকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেনকে। কেননা, জরুরীকালীন ওইসব সরঞ্জাম ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে না থাকলে আমরা হয়তো ভারতের এই দুই তরুণ দুঃসাহসীকে আর কোনওদিন খুঁজে পেতাম না। যেমন অসংখ্য অভিযাত্রী হারিয়েছেন হিমালয়ে বা অন্যান্য পর্বতে, তেমনি এরাও হারিয়ে যেত বঙ্গোপসাগরের নীল জলে।

মাঝ দরিয়ায় "কানোজি আংরে" এবং "ডিউক-পিনাকীর" হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা পরে বলছি। কিন্তু তার আগে বলে রাখি—ওদের এপারে বিদায় শুভেচ্ছা জানিয়ে কলকাতায় ফিরে শুনি নানা মহলে নানা সমালোচনা। এমন কি নৌবাহিনী, সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও বলছেন—এভাবে মৃত্যুর মুখে দুটি তরুণকে এগিয়ে দেওয়ার মানে কী? কেন তাদের ৫০০ মাইল রেঞ্জের ওয়ারলেস দেওয়া হয় নি? উত্তরও সহজ: বড় ওয়ারলেস দিলে নৌকোর

ওজন বেড়ে যেত আরও ৭০০ পাউণ্ড এবং যে কোন সময় সামান্য ঝড়ে 'আংরে' ডুবতো ।

এছাড়া নীতিগত প্রশ্নও ছিল। 'সমুদ্রের আবহাওয়া ভাল থাকবে' একথা বলেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। উপরন্তু কিছু ঝুঁকি না থাকলে তো অ্যাডভেঞ্চারের অ্যাডভেঞ্চারত্ব বজায় থাকে না !

তবুও সিলভিয়া সেট ছাড়াও আর একটি ওয়ারলেস দেওয়া হল। অতীতের খ্যাতনামা ফুটবলার ও হকি খেলোয়াড় কলকাতা মার্কনি সংস্থার প্রধান জে. লামসডেন ৩০ মাইল রেঞ্জের ওই সেটটি দেন। বিমান বাহিনী যে ওয়ারলেসটি দিলেন 'কন-টিকির' নেতা থর হেইয়ের ডালের মতো এতেও সেই রকম এরিয়েলে বেলুন উড়িয়ে ২০০ মাইল এলাকায় খবর পাঠানো যেত।

আজ ৩১শে জানুয়ারি—১৯৭০। অভিযানের আগে শেষ প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন মিহির সেন। ডালহৌসীতে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর দোতলার ঘরে গিয়ে দেখি সাংবাদিক ঠাসা প্রেস কনফারেন্সে এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিংও রয়েছেন। ডিউক-পিনাকীকে আশীর্বাদ জানাতে এসেছেন তিনি। বললেন, এই ধরণের অভিযানে আমাদের তরুণ সম্প্রদায় উদ্দীপিত হবেন ।

মিহিরবাবু বললেন, আগামীকাল ১লা ফেব্রুয়ারি কলকাতার ম্যান ও' ওয়ার জেটি থেকে অভিযান শুরু হবে। সাগরদ্বীপ পর্যন্ত মোটরলঞ্চে সাংবাদিকরা 'কানোজি আংরের' সঙ্গে যেতে পারবেন। ওয়ারলেসে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা থাকবে। তবে যারা খবর সংগ্রহে যাবেন তাঁদের

অনেক ঝুঁকি নিতে হবে। লঞ্চের খোলা ডেকে দিন ও রাত কাটাতে হবে, খাওয়া দাওয়াতেও কষ্ট হতে পারে।

আমি ওখানে দেরী না করে সোজা চলে গেলাম জেটিতে। 'কানোজি আংরে' জেটির সঙ্গে বাঁধা। কোন রকম সাজানো গোছানো নয়। একটু পরেই দেখি টেলিভিশন আর আকাশবাণীর প্রতিনিধিরা ডিউক-পিনাকীকে নিয়ে নানান ধরণের ছবি তুলছেন ও ইণ্টারভ্যু নিচ্ছেন। 'কাল দেখা হবে' বলে সোজা চলে এলাম অফিসে।

তলব এল: সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষের কাছ থেকে। তাঁর ঘরে ঢুকেই দেখি আন্দামান অভিযান নিয়ে তিনিও আলোচনা করছেন আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বার্তা বিভাগের কর্ণধারদের নিয়ে। রয়েছেন অমিতাভ চৌধুরী। অভীক সরকার, গৌরকিশোর ঘোষ ও শান্তিকুমার মিত্র।

সত্যি কথা বলতে কী—আমাদের দেশে এ ধরণের অভিযান এই প্রথম হচ্ছে জেনেও খুব গুরুত্ব আমি দিই নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে '৬৯ এর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ওঁরা এই অভিযানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ও তদনুযায়ী আমাকে নানা নির্দেশ দেওয়ার পর বুঝলাম আমার উপর গুরুদায়িত্ব বর্তেছে। সন্তোষবাবু বললেন, এমন ডেসপ্যাচ চাই যেন যে কোনও জায়গায় বসে কাগজ পড়ে বুঝতে পারি আমাদের চোখের সামনে 'কানোজি আংরে' আর ডিউক-পিনাকী গঙ্গার উপর দিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে চলেছে।

তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা। বার্তা সম্পাদক বললেন, কাল তো যাত্রা শুরু; কলকাতা থেকে স্যাণ্ডহেডস (মোহনা) পর্যন্ত 'কানোজি আংরে'র রুট ম্যাপ চাই, সঙ্গে রাইট আপ। 'মাঠ-ময়দানের' ভারপ্রাপ্ত মতি নন্দী বললেন, তুমি তো এক সপ্তাহের উপর কলকাতা ছাড়া হবে—আগামী সপ্তাহের লেখাটা রেখে যেও।

সব শেষ করে বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হল। ফিরেই তল্পিতল্পা

গুছিয়ে নিলাম। কিন্তু সেদিনও আনন্দবাজারের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতেন না—আমিও 'হাফ' অভিযাত্রী হতে চলেছি।

পরদিন—১লা ফেব্রুয়ারি সেই প্রথম বাড়িতে ফাঁস করলাম, আমিও যাচ্ছি মোহনা পর্যন্ত। ভেবেছিলাম কেউ না কেউ বাধা দেবেন। দেখি একেবারে উল্টো ব্যাপার। মাত্র বছরের ভাইঝিটিও সঙ্গে যেতে চায়।

সকালে খবরের কাগজ আসতেই ভিতরের পৃষ্ঠা খুঁজলাম। গত রাতে লেখা নিউজটা পড়ার জন্য। কোথাও না পেয়ে মন খারাপ হচ্ছিল। পৃষ্ঠা খুলতেই অবাক কাণ্ড। তিন কলম হেডিং 'আজ

'।

সঙ্গে ছোট্ট ম্যাপ।

সেই খবর :

আজ শনিবার বিকাল তিনটায় সেই দুঃসাহসী তরুণযুগল লেফটেন্যান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও পিনাকীরঞ্জন চ্যাটার্জি দাঁড় টানা নৌকো নিয়ে আন্দামান যাত্রা করবেন। আউট্রাম ঘাটের জনস্কিনার ম্যান ও' ওয়ার জেটিতে বেলা দেড়টায় এক অনুষ্ঠানের পর এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগে পিস্তল ছুঁড়লেই ছোট্ট নৌকো 'কনোজি আংরে' বন্দর ছেড়ে চলে যাবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন জেটি থেকে নৌকোটি খুলে দেবেন। শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযানের উদ্যোক্তা এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মিহির সেন জানান, ডিউক ও পিনাকী রোজ ছ' ঘণ্টা নৌকো বেয়ে যাবে। ঘণ্টায় ওদের গতি হবে ছ মাইল। রাত্রে দুজন এক সঙ্গেই ঘুমোবে। তখন ছোট্ট মাস্তুলের বাতিটি জ্বলতে থাকবে। হুগলী নদীর হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন বি, এস, প্যাভরি জানালেন, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে বঙ্গোপসাগরে বড় রকমের বিপদের সম্ভাবনা নেই।

'স্যাণ্ডহেডস পর্যন্ত পোর্ট কমিশনার্সের লঞ্চ কেন ওদের অনুসরণ করবে?' —এর উত্তরে তিনি বললেন, গঙ্গায় প্রবল স্রোত এবং তখন ঘন কুয়াশা; তাই ওদের সাহায্য করা হবে। গঙ্গাতেই ওদের শক্তির অপচয় করাতে চাই না।

তেনজিং নোরগে এই অভিযানের জন্য গর্বিত। বললেন, ভারতের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে আন্দামান অভিযানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

কতদিন লাগবে?

কলকাতা থেকে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব ৮০০ মাইল। পথটা অজানা নয়। কিন্তু দাঁড়টানা ছোট (২০ ফুট × ৫ ফুট) নৌকো 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে'র পক্ষে রীতিমত দুস্তর। সমুদ্রবক্ষে প্রয়োজনে আঁকাবাঁকা পথ ধরতে হবে, দূরত্ব বাড়বে আরও ২০০ মাইল। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত 'কানোজি আংরে'র কোন পাল নেই, নেই কোনো যন্ত্র: হাতিয়ার শুধু দাঁড়। দাঁড় বেয়ে অকূল দরিয়া পার হবে পঁচিশ বছর বয়স্ক ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার লেফটেনান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও বাইশ বছরের তরুণ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার গবেষক পিনাকীরঞ্জন চ্যাটার্জী।

আগে বলা হয়েছিল আন্দামান পৌঁছতে ৪৫ থেকে ৬০ দিন লাগবে। কিন্তু গত সপ্তাহে স্যাণ্ডহেডস থেকে ফিরে পিনাকী বলল, ৪৫ দিনেই পৌঁছে যাবো। ডিউক আরও আশাবাদী। ৩০ দিনেই পৌঁছোতে চায়। কারণ ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল এ. কে চ্যাটার্জী ওই সময় আন্দামানেই থাকবেন।

তবুও নৌকোয় ৬০ দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কম্পাস থাকলেও ওরা দিনের বেলায় সূর্যকে প্রধান দিগদর্শক করবে। রাত্রে ব্যবহৃত হবে কম্পাস। অধিনায়ক ডিউক নিজে বেতারবার্তা প্রেরণ ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও সহযাত্রীকে সব শিখিয়ে নিয়েছে। মহীশূরের প্রতিরক্ষা দপ্তরের খাদ্য পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে খাদ্যের গুণাগুণ যাচাই করে এসেছে।

ঐতিহাসিক অভিযান

প্রায় তিনশ' বছর আগের বণিক ইংরেজ, প্রথম যেখানে এসেছিল কেতন উড়িয়ে, কামানের বুম্ বুম্ শব্দে—কলকাতার সেই জায়গা থেকেই ডিউক ও পিনাকীর যাত্রা; কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন। ওদের মত মানদণ্ড থেকে রাজদণ্ড হাতে নেওয়া নয়। কলম্বাস বা ভাস্কো ডি গামার মত নতুন দেশ আবিস্কার তো নয়ই। এই অভিযানের ফলে আন্দামানের ওংগে বা জারওয়াদের সম্পর্কে নতুন তথ্যও জানা যাবে না। তবে ইউলিসিসের মত এমন কিছু রেখে যাবে যাতে আগামী দিনের তরুণ সম্প্রদায় উদ্দীপিত হবেন। মুষড়ে পড়া একালের ভারতীয় তরুণ-তরুণীরাও সঞ্জীবনীমন্ত্র খুঁজে পাবেন। এই অভিযান প্রমাণ করবে, বিশ্বের যে কোন যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁরা সমানে পাল্লা দিতে পারেন। রচিত হবে নতুন ইতিহাস।

এই ধরণের অভিযান এশিয়াতে ইতিপূর্বে হয়নি। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীতে এ নজীর আছে মাত্র একটি। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনের রোজার ও ব্লাইথ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাঁড় বেয়ে আটলান্টিক পার হন ও আয়ারল্যাণ্ডে পৌছান। ডিউক ও পিনাকীর সামনে ওই দুই অভিযাত্রীর প্রেরণা যেমন রয়েছে, তেমনি জ্বলজ্বল করছে স্যার ফ্রানসিস চিসেস্টার,

আলেক্স রোজ ও উইল ক্রায়েড আরডম্যানের নৌকোয় বিশ্ব পরিক্রমার কাহিনী। আর কাছেই সপ্তসিন্ধু বিজয়ী মিহির সেনের এগিয়ে চলার ডাক।

ডিউক ও পিনাকী আমাদের সমুদ্রের তেনজিং। এদের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় উৎকীর্ণ হয়ে থাকবেই। ইতিহাস তো এদের নিয়েই লেখা হয়!

কলকাতা থেকে স্যাণ্ডহেডস পর্যন্ত ওদের যাত্রাপথ

১লা ফেব্রুয়ারি: বিকাল ৩টায় যাত্রা শুরু, সন্ধ্যা ৬ টায় বাটানগর, ৬-৩০ মিঃ বজবজ, রাত ৮-৩০ মিঃ বিড়লাপুর, রাত ৯টা রয়াপুর (কলকাতা থেকে ২০ মাইল)।

২রা ফেব্রুয়ারি: রাত আড়াইটায় রয়াপুর থেকে ছেড়ে সকাল আটটায় কুঁকড়াহাটি পৌছোবে, ৩-৩০মিঃ ডায়মণ্ড হারবার, সন্ধ্যা ৭·৩০মিঃ হালদা (বাগনা পাড়া—কলকাতা থেকে ৫১ মাইল)।

৩রা ফেব্রুয়ারি: রাত ১টায় হলদিয়া থেকে ছাড়বে। সকাল ৭টায় অকল্যাণ্ড পৌছোবে, বিকাল ৫-৩০ মিঃ মিডলটন (কলকাতা থেকে ৮২ মাইল)।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি: রাত ১২-৫ মিঃ মিডলটন থেকে ছাড়বে। ভোর ৬টায় গ্যাসপার চ্যানেল, বিকাল ৫-৩০মিঃ ইণ্টারমিডিয়েট চ্যানেল। (কলকাতা থেকে ১১৩ মাইল)।

৫ই ফেব্রুয়ারি: রাত ১২-৫মিঃ ইণ্টারমিডিয়েট চ্যানেল থেকে ছাড়বে। তারপর স্যাণ্ডহেডস—অকুল দরিয়া। (কলকাতা থেকে ১৩১ মাইল)।

কলকাতার অন্যান্য দৈনিকেও ডিউক-পিনাকীর খবর গুরুত্ব পেয়েছে। সকালটা দ্রুত কেটে গেল। বাড়ি বসে কত শত ভাবছি। সাংবাদিকরা

সাধারণত আশাবাদী। আমার সামনে তখন 'কন-টিকি অভিযান' রয়েছে। এভারেস্ট, নন্দাঘুন্টি প্রভৃতি অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনীও। তবুও মাঝে মাঝে অবচেতন মনে কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। দেওয়ালে বড় ছুটো টিকটিকি একসঙ্গে 'ঠিক ঠিক ঠিক' করে উঠল। রোজ রাত্রে আমার খাওয়ার সময় এসে যারা রুটির ছোট টুকরো খায় আমার হাত থেকে, তারাও বলছে—ডিউক পিন্নু বিপাকে পড়বে? কিংবা বলছে তুমি যেও না? বিড়ালটাও ম্যাও ম্যাও করে ডাকছে কেন—কোনও অশনি সংকেত নয় তো?

সামনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। নিচে লেখা 'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'। উঠে গোছগাছ শুরু করলাম। তবুও মনে হতে লাগলো—আমি যাবো স্যাণ্ডহেডস অবধি, থাকবো লঞ্চ কিংবা জাহাজে, আমার যদি এত ভয়, তবে ওই ছুই বেচারার কী হাল এখন? পরে পিনাকীর কাছে শুনি, সারা সকাল ওর বাবা গম্ভীর ছিলেন, মার চোখে শুধু জল আর জল, ছোট ভাই দাদার সঙ্গে কথা বলেনি। বোনও গোমড়া মুখ করে বসেছিল। শুধু ওদের যে মাতব্বর 'পিন্নু দাদাবাবুকে' প্রায় কোলে পিঠে মানুষ করেছে সেই প্রবীন ভৃত্য বলেছে—'পারবে, আমার দাদাবাবু সাগর জয় করবেই'। সকালে রাসবিহারী রোডের মোড়ের কাছে (৬৮, সদানন্দ রোড) ওদের বাড়ি থেকে কালীঘাটে মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে এসেছেন ওর মা।

শেষ মুহূর্তেও নাকি পিনাকীর আত্মীয় স্বজনরা কেউ কেউ বলেছেন, যাসনি। ওর মা-বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন—যেতে দিও না ছেলেকে। কিন্তু পিনাকী সংকল্পে অটল। এতটুকু চঞ্চল হয়নি সে। বাবা, মার অজান্তে সে আন্দামান অভিযানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে ইণ্টারভ্যু দিয়েছিল, বণ্ডও লিখে দেয় পরে।

ভাবনা-চিন্তার বালাই ছিল না ডিউকের। বাবা-মা, ভাই-বোন বিদেশ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, তোমার যাত্রা শুভ হোক।

এখন বেলা একটা। গঙ্গার তীরে ম্যান ও' ওয়ার জেটিতে পৌঁছে দেখি 'কানোজি আংরে' সামান্য ঢেউয়ে হেলছে, দুলছে। তার খোলে প্রয়োজনীয় সব জিনিষ—আষ্টে-পিষ্টে বাঁধা। নৌকো রং বেরং-এর পতাকা আর ফুলে সাজানো। সাজানো হয়েছে ম্যান ও' ওয়ার জেটিকে। নৌবাহিনীর ব্যাণ্ড। উপরে গঙ্গার তীরে হাজার হাজার মানুষ—আবাল বৃদ্ধ। ডিউক পিনাকী ও 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে'কে তাঁরা অভিনন্দন জানাতে এসেছেন।

দুটো নাগাদ এলুম অভিযাত্রীরা। দুজনের কপালেই সিঁদুর—কালীঘাটের সিঁদুর টিপ। তখন ওরা সাধারণ পোশাকে। অভিযানের গান, বাজি, বক্তৃতা আর 'ডিউক পিনাকী জিন্দাবাদ' ধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হল। ডঃ ত্রিগুণা সেন জেটি থেকে নৌকোর দড়ি খুলে দিলেন। গঙ্গাতীরে ও মাঝনদীতে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড।

আগেই ঠিক ছিল সাগরদ্বীপ (গঙ্গাসাগর) পর্যন্ত তিনটি লঞ্চ এদের অনুসরণ করবে। ওতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। খবর পাঠাবার জন্য সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ওয়ারলেস। দিনে রাতে খবর পাঠানো যাবে। তিনটি লঞ্চ—'দশরথ', 'গণপ' ও 'ন্যান্সি'।

লঞ্চে পা দিয়েই দেখি মিহিরবাবু যা বলেছিলেন ঠিক তাই। ডেকের উপর ক্যাম্বিস খাট। ডেকের চারিদিকে চট ঘেরা। সঙ্গী অগ্রজ সাংবাদিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের জিতেনদা (জিতেন সেন) রেগে আগুন। ইংরেজি-বাংলায় অনেক কিছু বললেন, বেশ মনে পড়ছে কয়েকটি কথা: আমরা মানুষ না গরু ভেড়া? ওঁর এইসব কথা অবান্তর ছিল না। বড়ো মানুষ (৬২) স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অনেক আন্দোলনে নানা কষ্ট সহ্য করলেও বড় ঘরের মানুষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাগ্নে। ওঁর অসুবিধার কথা জানালাম অভিযানের মার্শাল অমর ম্যাটার্জি ও সঙ্গী ক্লাবের অপর কর্মকর্তা সেক্রেটারী অশোক দাশগুপ্তকে, যদিও জানতাম অভিযানে কষ্ট করতেই

হবে। যে কোন সময় সমূহ বিপদ ঘটতেও পারে—এমন কি মৃত্যুও।

বিভিন্ন কাগজে সংবাদের স্কুপ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা থাকলেও দাবি পূরণের দাবিতে আমাদের মত একতার জুড়ি বোধ হয় আর নেই।

স্টেটসম্যানের মানস ঘোষ সেদিন সঙ্গী হয়নি। বলে গেল, সে আগামী কাল ডায়মণ্ডহারবার থেকে উঠবে। রয়েছি জিতেনদা ও আমি, আমাদের ফটোগ্রাফার বিজন ব্যানার্জি, ইউ এন আই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের শংকর চৌধুরী, যুগান্তরের মানিক ব্যানার্জি, শিপিং অ্যানড পোর্ট রিভিউ-র পদ্মনাভন। শেষ দুজন ছাড়া আর সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ।

জিতেনদা, আমি ও বিজন 'গণেশ'-এ, শংকর 'হ্যাপ্পিতে' এবং মানিক 'দশরথে'। জিতেনদা আবার বললেন, এইভাবে খুব কষ্ট হবে। 'দশরথ'কে দেখে মনে হচ্ছে ওখানে অনেক কেবিন আছে। আমাদের ছয় জনের থাকতে অসুবিধে হবে না। কাল মানস এলে ওকেও দলে নিতে হবে। জিতেনদাকে কথা দিলাম—এক্ষুনিই ব্যবস্থা করছি। বিজন ওর দেশী ভাষায় আশ্বাস দিল—আপনি যা কইছেন। তারপর আমাকে কিছু গাল দিয়ে বলল—সব ব্যবস্থা না হইলে চিরঞ্জীবরে গঙ্গার জলে ফেলাইয়া দিমু।

হাতে নোট বই ও কলম। বসে আছি 'গণেশে'র ছাদে সারেঙের পাশের একটি টুলে। গঙ্গায় তখন প্রবল জোয়ার, অর্থাৎ 'কানোজি আংরে'র বিপরীত মুখী স্রোত। নৌকো ছাড়ার আগেই ওরা পোশাক বদলে নিয়েছিল। উভয়েরই গাঢ় সবুজ ট্র্যাকস্যুট! সঙ্গে দুটো তালপাতার টুপি। পরদিন (২রা ফেব্রুয়ারি) আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনকলম ছবি সহ যাত্রা শুরু অনুষ্ঠানের বিবরণ বের হল বন্ধুবর অনন্ত জানার লেখনিতে :

"এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগের পিস্তলের আওয়াজ, তীর থেকে তোপধ্বনি, নদীবক্ষে নানা যানের আরোহী ও তীরবর্তী অগণিত পরিচিত, অপরিচিত মানুষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও করতালির মধ্য দিয়ে হাসিমুখে সেই দুই দুঃসাহসী তরুণ লেফটেনান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও পিনাকী রঞ্জন চ্যাটার্জি শনিবার (১লা ফেব্রুয়ারি) বিকাল তিনটেয় ম্যান ও' ওয়ার জেটিতে তাদের তরী ভাসাল আন্দামানের পথে।

তীরের অদূরে তখন গান চলছিল—যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুন্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল, তালে তার দিও তাল, জয় জয় জয় গান গাইও।

তার আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন 'কানোজি আংরে' নৌকোটি খুলে দিলেন। দুই তরুণের মাথায় হাত রেখে নিরাপদ জয়যাত্রা কামনা করলেন, অভিভূত অভিযাত্রী দুজন আনত হয়ে সকলকে শ্রদ্ধা জানাল তারপর তরীতে পা দিল। হাত নেড়ে বন্দরের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাঁড় কষে ধরে 'হাঁই মারো মারো টান হাঁইয়ো'র তালে তাল মিলিয়ে বেয়ে চলল।

জেটির একধারে দুই অভিযাত্রীর আত্মীয়-স্বজন পাপাপাশি দাঁড়িয়ে। বড় বিচলিত দেখাচ্ছিল। তাঁদের অপলক দৃষ্টি গঙ্গাবক্ষে ভাসমান ছোট্ট তরীটির দিকে। সে এগিয়ে চলেছে দূর হতে দূরে।

এর আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেন তাঁর ভাষণে বলেন, প্রাচীন কাল থেকে মানুষ অজানাকে জানবার আগ্রহে অনেক দুঃসাহসী অভিযানে পাড়ি দিয়েছে। জ্ঞানের সীমার বাইরে যে অনন্ত রহস্য অনাবিষ্কৃত রয়েছে তাকে উদ্ঘাটিত করার চেষ্টায় মানুষ মহাকাশ জয় করেছে। চন্দ্রলোকে তার অভিযান সার্থকতার দিকে এগুচ্ছে, বিজ্ঞান ও কারিগরির এই বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগে এই দুই তরুণ কোন যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে দাঁড় টানা নৌকোয় পাড়ি দিতে

চলেছেন—এটি বলিষ্ঠ আত্ম প্রত্যয় ও দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ। এদের সাফল্য দেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করবে।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান [illegible] সেন ব[illegible] ভারতীয় তরুণ তরুণীদের ঘরমুখী মনোভাব পরিহার করে সমুদ্রযাত্রা ও দুঃসাহসী অভিযানে উৎসাহিত করার জন্যই এই উদ্যোগ আয়োজন।

শ্রীসেন মনে করেন, ৪৫ থেকে ৬০ দিনে নৌকো আন্দামানের তীরে ভিড়বে।

তেনজিং নোরগে বললেন, এই দুই তরুণ ভয়াবহ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন, ভারতীয় বলে এজন্য তিনি গর্বিত।

হুগলী নদীর হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন বি, এস, পাভিরি জানালেন, এখন সমুদ্রে বড় রকমের কোন বিপদের আশংকা নেই। তবু তাঁরা [illegible]ব রকমের সাহায্য করবেন।

[illegible] উপস্থিত থাকতে না পেরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সেন তাঁর বি[illegible] ত্যার গবেষক পিনাকী চ্যাটার্জি ও লেঃ জর্জ ডিউককে আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়ে এক বাণী পাঠিয়ে দেন।

[illegible] ও সংস্থার পক্ষ থেকে দুই অভিয[illegible] গোলাপের গুচ্ছ ও মালার পর মালা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়।

কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এর পক্ষ থেকে ম্যান ও ওয়ার জেটি থেকে ১২৫ মাইল দূরে স্যাণ্ডহেডস পর্যন্ত অভিযাত্রীদের পৌঁছে দিতে একটি লঞ্চ অনুসরণ করছে।

ওই খবরের পাশেই 'ভাটার টানে' হেডিং-এ আমার পাঠানো ধারা বিবরণী:

"গণেশ মোটর লঞ্চ, ১ ফেব্রুয়ারি—প্রথম ঘন্টায় 'কানোজি আংরে' আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে। কারণ গঙ্গায় প্রবল জোয়ার ছিল।

তারপর হঠাৎ নৌকোর গতি বেড়ে গেল। আমাদের লঞ্চের সারেং শ্রীবড়ুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, কত নটিকাল মাইলে চলছে?

তিনি বললেন, স্পিড নেই। ভাঁটা হোক। এক ঘণ্টা পর স্পিড বেড়ে গেল। 'কানোজি আংরে' আমাদের কাছেই। ডিউকের বাঁ হাতে সিগারেট, ডান হাতে দাঁড়। পিনাকীর বাঁ হাতে দাঁড়। ওর সিগারেটের নেশা নেই।

বিকাল ৩টা ৪০ মিনিট : হঠাৎ দেখা এবং প্রথম এই দেখা হল একটি বিদেশী জাহাজের সঙ্গে। নাম 'আইকোপোনি'। ওরা ভোঁ বাজিয়ে অভিনন্দন জানালো।

৩ টা ৪৮ মিনিট : লঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে পিনাকীকে বললাম, চা খাবে নাকি? জবাব দিল, পাঠিয়ে দিন। ওদের দুজনের পরনে গাঢ় সবুজ 'ট্র্যাক স্যুট'। নৌকোয় তিনটি পতাকা। নেভির, এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের ও ভারতের জাতীয় পতাকা। সবকটি এক সঙ্গে গঙ্গার হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

৩টা ৫৫ মিনিট : বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি 'গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ'; ওখানেই এই নৌকো তৈরি হয়েছে। কর্মীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে নদীর পাড়ে। 'কানোজি আংরে'তে যাত্রী তিনজন। তৃতীয় ব্যক্তি লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার প্রধান দাস। পিনাকী বলল, আপনার কাগজে সব লিখে দেবেন, যা পড়বে। ওরা দুজন টুপি পাল্টে নিল। তালপাতার বদলে [illegible]।

৩টা ৫০ মিনিট : ডিউককে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কথা কী লিখব? [illegible] তো বাংলা কাগজ — জবাব দিল ডিউক। আমার প্রেমিকা পড়তে পারবে না। এই সময় নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে গঙ্গায় সাতটি তরুণ [illegible] — অনেক হাতে [illegible] ভাল। ডিউক ও পিনাকীর [illegible] আমরা হাইকোর্ট পার হয়ে ঘুরলাম; বাঁদিকে [illegible] দুই তীরে লোক দাঁড়িয়ে, অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

৫ টা ১৫ মিনিট : সূর্য ডুবে গিয়েছে। মাঝে মাঝে চটকল আর গ্রাম। পিনাকীর কাছে শুনলাম, একটি দাঁড় ভেঙে গিয়েছে, নদীতে তখন অন্ধকার। লঞ্চের সার্চলাইটে দেখলাম ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। দাঁড় দুটো তোলা।

সাতটা নাগাদ বজবজে পৌঁছলাম। বাটানগর ও বজবজ সব জায়গাতেই দু দিকে শত শত লোক দাঁড়িয়ে। সকলেই অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। আজ রাত্রে রয়াপুরে থাকব।"

২রা ফেব্রুয়ারি আমাদের পত্রিকার 'যৎকিঞ্চিৎ'-এ ওদের শুভেচ্ছা কামনা করে লেখা হয় :

"দুইজন তরুণ, লেফটেনান্ট জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক ও পিনাকী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গত শনিবার দাঁড়টানা নৌকা করিয়া আন্দামান যাত্রা করিয়াছেন। প্রথম জনের বয়স পঁচিশ, দ্বিতীয়জন বাইস বৎসর বয়স্ক। অভ্যস্ত জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া তাঁহারা এই দুঃসাহসিক অভিযানে যাইতেছেন। দুর্জয়কে জয় করিবার, অজানাকে জানিবার, দুর্লভকে লাভ করিবার দুঃসাহসের আহ্বানে সব দেশের তরুণেরাই যুগে যুগে ছুটিয়া গিয়াছেন। কখনও সফলতার জয়মাল্য গলায় পরিয়া তাঁহারা ফিরিয়াছেন। যেখানে তাঁহাদের দুশ্চর সাধনা পুরা সিদ্ধিলাভ করে নাই, সেখানেও ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ তাঁহারা প্রশস্ত করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশের তরুণেরাও যে এদিক দিয়া পিছনে পড়িয়া নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহারা বার বার দিয়াছেন। দেখাইয়াছেন যে, দেশের তরুণেরা সকলেই ভাঙনের নেশায় মাতিয়া নাই। দেশের গৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয়, জাতির মুখ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, দেশের অসংখ্য তরুণ সেই সাধনাকেও জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুই অসমসাহসিকের এই প্রয়াসও দেশের গৌরব বৃদ্ধির ঐকান্তিকতা প্রসূত।

তাঁহাদের এই অভিযানকে 'কন-টিকি' অভিযানের সঙ্গে তুলনা করিব না। কিন্তু এই অভিযানের গুরুত্বও ছোট করিয়া দেখা সঙ্গত হইবে না। কলিকাতা হইতে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব নৌকা পথে হাজার মাইলেরও কম হইবে না। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে বৃহৎ বিপদের সম্ভাবনা না থাকিলেও অশান্ত বঙ্গোপসারের খেয়ালকে তুচ্ছ করা চলে না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তরুণদ্বয় দাঁড়বাহী ছোট নৌকায় তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার অভিযান শুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রয়াস জয়যুক্ত হইয়া ভারতের তরুণ সমাজে দুঃসাহসী অভিযানের প্রেরণা সঞ্চার করুক, ইহাই কামনা।"

আগেই বলেছি কে কোন্ লঞ্চে থাকবে সে নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। প্রথম দিন সাড়ে চারটে নাগাদ অর্থাৎ যখন আমরা গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসপের কাছাকাছি—তখন চায়ের সময় 'দশরথ' আমাদের 'গণেশের' গায়ে ভিড়তেই জিতেনদা আর বিজন তল্পিতল্পা নিয়ে 'দশরথে' উঠে গেলেন। ওঁরা আমাকে নিয়ে টানাটানি করলেন—আগে শরীর তারপর আর সব। আমি 'গণেশ'-এর ছাদে নোট বই, প্যাড আর বায়নাকুলার নিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। বার্তা সম্পাদকের নির্দেশের কথা মনে পড়ল—সব সময় অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। সংযুক্ত সম্পাদকের উপদেশ চোখের সামনে ভেসে উঠল—'ঘড়িতে সময়, আকাশে চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি এবং গঙ্গা বা সমুদ্রকে বাদ দিয়ে যেন রিপোর্ট না হয়। আমরা যারা কলকাতায় নির্বাচনী দামামা বা অন্যান্য কোলাহলের মধ্যে দিন কাটাব তারাও যেন ওদের অভিযানকে চোখের সামনে পাই।'
লঞ্চে উঠেই তাই পুলিশ ওয়ারলেসের কর্মীদের সঙ্গে শুধু আলাপ করেই

নয়—ভাব জমিয়ে নিলাম। আমার আসল নামের সঙ্গে একজনের মিল পেলাম।

কিন্তু সন্ধ্যা না হতেই ঝঞ্ঝাট দেখা দিল। ওয়্যারলেস কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে বন্ধ হতে থাকল। পি-পি-পিপ্। পিপ-পি ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার চালুও করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই কলকাতা থেকে খবর গেল যে, খবর পাঠানো যাবে কিন্তু বিভিন্ন কাগজের অফিসে তা পৌঁছাবে কিনা সন্দেহ। কারণ ওদের পাঠানো বার্তা গ্রহণ করবে চব্বিশ পরগণার যাদবপুর থানার ওয়্যারলেস রিসিভিং সেন্টার—রাইটার্স বিল্ডিংসের রাজ্য পুলিশের হেড কোয়ার্টার্স নয়। প্রথমত যাদবপুর থেকে 'মেসেজ' বয়ে নিয়ে প্রত্যেক কাগজের অফিসে পৌঁছে দেওয়ার মত লোকের অভাব খুব। কারণ অধিকাংশই প্রাক-নির্বাচনী গণ্ডগোল, ধানকাটা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। তাছাড়া গোটা চব্বিশ পরগণার খবর যাদবপুর রিসিভ করে যে! ওয়্যারলেসের একজন অফিসার বললেন, ল অ্যাণ্ড অর্ডার টপ প্রায়রিটি তারপর এইসব বাজে ব্যাপার। দাঁড় বেয়ে কে কতদূর গেল না গেল তাতে কারুর কিছু আসে যায় না।

'বাজে ব্যাপার?'—আমি উত্তর দিতে উদ্যত হয়েও উত্তর দিলাম না। কেন না, এ ক'দিন ওদের সঙ্গে কাটাতে হবে। উপরন্তু যে ভাবেই হোক, ওরা ছাড়া খবর পাঠাবার আর কোনও মাধ্যম নেই। মেজাজ খারাপ না করে বুঝিয়ে বললাম—অভিযানটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন, টুকরো টুকরো মেসেজ দেবেন সারাদিন ধরে। কলকাতা খালি থাকলেই রিসিভ করবে। খবরদার একসঙ্গে বা দিনের শেষে ডেসপ্যাচ দেবেন না। তবে ১লা ফেব্রুয়ারী কোন খবর কলকাতায় যাবে না—এমন কিছু শুনলাম না ওদের কাছে। বললেন, খালি হলেই চলে যাবে, ভাববেন না।

আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। 'গণেশ'এর ছাদে উঠে সাত-পাঁচ

ভাবতে লাগলাম। খবরই যদি পাঠাতে না পারি এলাম কেন? 'গণেশ'এর সারেং বড়ুয়া বললেন, অত চিন্তা করবেন না। উপায় একটা হবেই। 'দশরথ'কে কাছে পেয়ে বিজন ও জিতেনদাকে ওয়ারলেস গোলমালের কথা জানালাম। বিজন 'দশরথের' ভারপ্রাপ্ত অফিসার কৃষ্ণধন মুখার্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে ফেলেছিল। বিজন বলল, প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর মুখার্জি পোর্টের ওয়ারলেস স্টেশন রামনগরের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তোমার খবর পাঠাইও। মুখার্জির স্মরণাপন্ন হলাম। তিনি রামনগরের সঙ্গে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কথা বললেন। নিউজপেপার মেসেজ তারা কলকাতায় রিলে করতে পারবে কিনা। উত্তর এল—'না'।

তখন গঙ্গায় অন্ধকার নেমে এসেছে। একেবারে গাঢ় অন্ধকার। কাছের লোকটিকেও দেখা যাচ্ছে না। তবে নদীর দুই তীর থেকে 'ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ' ধ্বনি ভেসে আসছে শুনতে পাচ্ছি। তারা টর্চ দিয়ে 'কানোজি আংরে'কে দেখছেন; সিগন্যালও দিচ্ছেন। রঙিন হাউই বাজি উড়ছে। দুম্‌দাম্ পট্‌কা ফাটছে। কোরাস গান ভেসে আসছে—'দুর্গম-গিরি-কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'। 'চলরে, চলরে চল' ইত্যাদি। বাটানগর, আক্রা ছাড়িয়ে বজবজ পৌঁছেছি। পুলিশের মোটর লঞ্চ 'বিভা মুখার্জি'র সঙ্গে দেখা হল। ওরাই আমাকে বজবজ থানায় পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে টেলিফোনে কলকাতায় আমাদের অফিসে সংক্ষেপে ধারা বিবরণী পাঠালাম। তবুও লাইন পেতে ও কথা বলতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ঘাটে ফিরে শুনি 'কানোজি আংরে', 'দশরথ', 'গণেশ' ও 'ন্যান্সি' অনেক দূরে চলে গিয়েছে ভাঁটার টানে। 'বিভা মুখার্জি'র কর্মীরা দ্রুতগতিতে ছুটলেন ওই অন্ধকারে অভিযাত্রীদের দিকে। কারণ উজান ঠেলে ওঁরা ওই রাত্রেই কলকাতায় ফিরবেন।

'বিভা মুখার্জি' ফুল স্পীডে উলুবেড়িয়ার কাছে গিয়ে আমাকে

'দশরথে' তুলে দিল। তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে। তিনটি লঞ্চেই তখন খোঁজ খোঁজ পড়ে গিয়েছে, আমি কোথায়—বিশেষ করে সাংবাদিকদের মধ্যে। বিজন ও জিতেনদা, কেবল জানতেন, আমি কোথায়।

লঞ্চের সার্চ লাইট দিয়ে দেখলাম 'কানোজি আংরে' ভাঁটার টানে এগিয়ে চলেছে। মাস্তুলের ফ্ল্যাগে হাওয়া লাগায় ও গঙ্গায় সামান্য ঢেউ ওঠায় সে যেন তুলকি চালে এগিয়ে চলেছে। ডিউক-পিনাকী দাঁড় তুলে বসে, হালে কম্যাণ্ডার দাশ। আটটা কুড়িতে হঠাৎ উলুবেড়িয়ার দিকে একসঙ্গে চীৎকার শুনলাম—'ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ'। রং বেরং-এর হাউই উড়ছে, উড়ন তুবড়িও। হিপ্ হিপ্ হুররের মাঝে শঙ্খধ্বনি। মাইক্রোফোনে গান ভেসে আসছে—ওগো কর্ণধার, আকাশে বাতাস উঠুক ইত্যাদি··· ।

রাত নটায় মায়াপুরের কাছে পৌঁছোলাম। স্থির ছিল আটটায় ওখানে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু দুপুরে উজান বেয়ে আসতেই 'কানোজি আংরে' একঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে।

মনে হল নৌকো আর চলছে না। আমাদের লঞ্চগুলোও যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। শুধু 'দশরথের' ইঞ্জিন চালু, যাতে পিছিয়ে না যাই। বাকি দুখানি লঞ্চ দু পাশে বাঁধা।

'গণেশ'-এ গিয়ে শুনি ওয়ারলেসে অবিরাম পি-পি-পিপ্ পিপ্ ইত্যাদি শব্দ। কিন্তু আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। ইতিমধ্যে ইউ এন আই-এর শংকর, পি টি আইয়ের পক্ষে এক্সপ্লোয়ার্স ক্লাবেরই ও আমাদের সঙ্গী সিংদেও এবং যুগান্তর অমৃতবাজারের মানিক খবর পাঠিয়েছে কলকাতায়। কিন্তু তা যে ওদের স্ব-স্ব অফিসে পৌঁছেছে এমন উত্তর কেউ দিতে পারল না। আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন খবর পাঠালে না?

আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউয়ের

মাথাগুলো চিকচিক করছে। মার্শাল অমর চ্যাটার্জি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেন—হ্যালো ডিউক, আর ইউ অল রাইট? ডিউকের উত্তর—ইয়েস।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দুপাশের গ্রামগুলো অন্ধকার। নদীর মাঝে বয়াগুলোর আলো আলেয়ার মত জলছে নিভছে। চাঁদের আলোয় 'কানোজি আংরে'কে আবছা দেখতে পাচ্ছি 'দশরথের' ডেক থেকে। সওয়া নটায় ওরা একটা বয়া ধরে নৌকো বেঁধে রাখল কেন বুঝলাম না। আবার দুমিনিট পরেই বয়া ছেড়ে চলে গেল। ওরা তখন আমাদের কয়েক গজের মধ্যে। এবার পিনাকীর চীৎকার: চিরঞ্জীবদা, কলকাতায় খবর পাঠিয়েছেন তো? নটা কুড়িতে 'ন্যান্সি'র গায়ে নৌকো বেঁধে ফেলে ওরা লঞ্চে উঠে পড়লো। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওখানেই আমাদের রাত্রি যাপনের কথা। মায়াপুরে আমাদের প্রথম নোঙর পড়ল।

তখন নটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। ডিউক পোশাক পরিবর্তন না করেই ওয়ারলেসের পাশে বসে কলকাতায় নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বার্তা পাঠাল। ওর কপালে তখনও দুপুরের সেই সিঁদুরেব ফোঁটা রয়েছে।

দশটায় খেয়ে সাড়ে দশটায় ঘুমুতে যাওয়ার আগে দুই অভিযাত্রীর পক্ষ থেকে ডিউক আমাকে বলে গেল, We wish to thank all the emotional send off that has been given to us. The spirit with which you have cheered us on is the spirit with which we shall row our boat to the Andamans.

১লা ফেব্রুয়ারি ওয়ারলেসে আমি কেবল এই মেসেজ টুকুই পাঠিয়েছিলাম।

সাড়ে এগারটা নাগাদ ঘুমুতে গেলাম বটে, কিন্তু আড়াইটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। ডিউক, পিনাকী, কম্যাণ্ডার দাস কফিতে চুমুক দিয়ে

তৈরি হয়ে নিলেন। দুটো পঞ্চান্নয় আবার নৌকো বাওয়া শুরু হল। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। দূরে সার্চ লাইটের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা দেখে মনে হল জাহাজ আসছে। নদীতে প্রচণ্ড হাওয়া, কিন্তু ঝড় নয়। পিছনে পিছনে আমাদের লঞ্চ ধীর গতিতে এগোচ্ছে। চারটে বাজতে ওরা লঞ্চের কাছে এসে চা নিয়ে গেল। আমি ডেকের উপরে ইজিচেয়ারে বসে আছি আলোয়ান মুড়ি দিয়ে। মাঝে মাঝে যখন নিদ্রাদেবী সমোনাস আমাকে ভব করছেন, তখন দুচোখের পাতাগুলো বুঁজে আসছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময় ডিউক-পিনাকীর কথা ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। ভাবছিলাম অকূল দরিয়ায় গিয়ে ওদের কী হবে? আজ ওদের কারুর বদলে আমি নৌকোয় থাকলে আমাব আপনজনের মনের অবস্থা কেমন হত ইত্যাদি। তাই সমোনাস বোধ হয় পরাভূত হচ্ছিলেন।

পাঁচটা বাজতেই পূব আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। ২রা ফেব্রুয়ারির দিনের আলো দেখা গেল। 'কানোজি আংরে' প্রায় মাঝ গঙ্গায়, আমরা পূর্বতীর ঘেঁসে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তখন ওরা আমাদের অনেক পিছনে। এতক্ষণ আকাশ পরিষ্কার ছিল, ছটা নাগাদ সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিন্তু মেঘ ঘন কালো নয়। সব উড়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। সামনে দু'একটা পাল তোলা নৌকো। এক ফাঁকে কেবিনে ঢুকে দেখি সকলে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন—জিতেনদা, বিজন, শংকর, মানিকও। 'আংরে' কিছু এগিয়ে এল। বেশ দেখতে পাচ্ছি ডিউক-পিনাকীর দাঁড় তোলা। ওরা শুয়ে। হাল ধরে বসে রয়েছেন কম্যাণ্ডার দাশ। ছটা দশ এ ওরা দাঁড় বাওয়া শুরু করল। কম্যাণ্ডার তাল ঠুকছেন, 'আংরে'ও যেন ঢেউয়ের সঙ্গে সেই তালে এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে দুই তীরের গ্রামগুলো স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ধোঁয়া উঠছে ইঁট ভাটার। বাঁদিকে কোন্ গ্রাম? 'দশরথে'র এক কর্মী বললেন, সামনে ফলতা। ওখান থেকে ৮৩ নম্বর বাস ছাড়ে,

কলকাতায় যায়। বয়ার উপর বসে সাদা সাদা বক, ব্রেক ফাস্ট শুরু করেছে ওরা। মাছ ধরতে ওরা মাঝে মাঝে জলে উড়ে পড়ছে। 'আংরে'র সামনে কী যেন একটা লাফিয়ে আবার ডুব দিল। সারেং বললেন, হাঙর নয়।

সোয়া ছয়টায় সূর্য উঠে গিয়েছে। ওরাও আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে। এই প্রথম ওরা দুজনে একসঙ্গে চারটে দাঁড় বাইছে—এগিয়ে আসার জন্য। প্রায় দুই ঘণ্টা ওরা এইভাবে চলল। তখন আটটা। বায়নাকুলার দিয়ে দেখি ডিউক দাঁড় তুলে, বাইছে শুধু পিনাকী।

সাড়ে আটটায় হুগলী পয়েনট-এ আমাদের লঞ্চ নোঙর ফেলল। ওরা লঞ্চে উঠে এল। সকাল থেকেই 'আংরে'র হালটা বড্ড গোলমাল করছিল।

কম্যাণ্ডার দাশ হিসেব কষে জানালেন, কাল রাত দশটা পর্যন্ত ওরা আঠার মাইল নৌকো বেয়েছিলেন, শেষ রাত্রের পর থেকে এখন পর্যন্ত এসেছে ষোল মাইল। অর্থাৎ কলকাতা থেকে এখন আমরা চৌত্রিশ মাইল দূরে।

রাত্রে ঘুম হয়নি। ব্রেকফাস্টের পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বিজন এসে এক ধাক্কা দিল। 'শুইয়া রইছস, ওদিকে যে নিউজ হইয়া গেল।' হাফ প্যান্ট গেঞ্জী পরেই কেবিন থেকে এক নিঃশ্বাসে ডেকে উঠে দেখি 'আংরে'র হাল নিয়ে কম্যাণ্ডার রথীন দাশ ব্যস্ত। সঙ্গে ডিউক পিনাকী। 'আংরে'র সঙ্গে হাল যে দুটি পিতলের হুক দিয়ে আটকানো ছিল সেই হুকের একটি ভেঙে গিয়েছে।

নানা প্রশ্ন উঠল, আশংকাও। একদিন না কাটতেই হুক ভেঙে গেল—মোহনা পর্যন্ত ওরা যাবে কী করে, তারপর পড়ে রয়েছে অকূল দরিয়া! কম্যাণ্ডার দাশকে এ নিয়ে একটুও চিন্তিত মনে হল না। তবে তিনি হুক বদল করতে চান, হালটাকে অন্যকোন উপায়ে নৌকোর সঙ্গে জুড়ে রাখা যায় কিনা ডিউকের সঙ্গে সে নিয়ে আলোচনা করেই 'গণেশ' এ উঠে

পড়লেন। অদূরেই ড্রেজার 'চূর্ণী' রয়েছে। ওখানে হাল মেরামতের যন্ত্রপাতি আছে, রয়েছে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররা। কম্যাণ্ডার দাশের সিগন্যাল পেয়ে 'চূর্ণী' মাঝ গঙ্গায় মাটিকাটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখলো। সাড়ে দশটার মধ্যে হাল মেরামত হয়ে গেল। 'চূর্ণী'র ক্যাপ্টেন প্রতিশ্রুতি দিলেন, ডায়গুহারবারের মধ্যে কোনও অঘটন ঘটলে আমরা যেন বেতারে খবর দিই। উনি সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। ২রা ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজার প্রথম দেখলাম 'চূর্ণী'তে।

হুগলি পয়েণ্টের মাঝ গঙ্গায় হঠাৎ প্রবল হাওয়া উঠল, ফেঁপে ফুলে উঠছে গঙ্গাও। জোয়ার শুরু হয়েছে, ঘাবড়াবার কিছু নেই, 'গণেশে'র সারেং বললেন, এসব নিত্য ঘটনা।

'দশরথে' পৌঁছে দেখি সব খবরের কাগজ এসেছে। প্রথম পৃষ্ঠাতেই অভিযানের খবর। কিন্তু সেদিনের কাগজে ছয় জন সাংবাদিকের মধ্যে আমার ছাড়া আর কারুর ডেসপ্যাচ বের হয় নি। ওয়ারলেসকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম রাত একটার মধ্যে কারুর খবর অফিসে পৌঁছায় নি। 'কিন্তু তোমার খবর পৌঁছোল কী করে?' সতীর্থদের প্রশ্ন। বিজনই জানিয়ে দিল—কাল সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য ও অদৃশ্য হইছিল মনে পড়ে? তহনই কাম সারছে। শংকরকে তেমন চিন্তিত মনে হল না, কারণ ওর এজেন্সীর খবর বাইরের কাগজে ও রেডিও পেলেই যথেষ্ট। যেটুকু চিন্তিত ছিল তাও এক টিপ নস্যিতে নস্যাৎ করে দিল। সবচেয়ে নিশ্চিন্ত পদ্মনাভন। ওর 'পোর্টরিভিউ' পাক্ষিক কাগজ। খবর পাঠাবার বালাই নেই। নিশ্চিন্তে সে সিগারেটের পর সিগারেট উড়িয়েছে একটি সপ্তাহ—তাও বেশির ভাগ পরস্মৈপদী। কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত আমাদের গোপন আলোচনার মাঝে নিঃশব্দে প্রবেশ এবং মাঝে মধ্যে সাংবাদিকতা সম্পর্কে জ্ঞান দান (আমরা তা গ্রহণ করছি এমন ভাবও দেখাতাম) আমাদের আনন্দ দিত। বিজন যখন ওর দেশী বরিশালের ভাষা ছাড়তো, পদ্মনাভনও সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় উণ্ডু, মুণ্ডু, কুরচুণ্ডু

প্রয়োগ করতো। আমি চট্টগ্রামের একটি বাক্য জানতাম, ব্যবহারও করতাম পদ্মনাভনকে লক্ষ্য করে—খোড়ে খন আইস (কোথায় যাচ্ছো)। পদ্মনাভন শুনে রেগে লাল হতো। সে ভাবতো আমি ওর মা-বাপ তুলে ভীষণভাবে গালাগাল দিচ্ছি।

মন খারাপ ছিল মানিকেরই। সে গতকাল সকলের আগে ওয়ারলেসে নিউজ ফাইল করেছিল। কিন্তু একটি লাইনও বের হয় নি। বললাম, ইলেকশনের ডামাডোলে কেউ হয়তো লক্ষ্য করেন নি। কিংবা অফিসে আদৌ পৌঁছায়নি।

পদ্মনাভনের মতো কিছু নিশ্চিন্তে ছিলেন জিতেনদা। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিনিধিরূপে এলেও ওঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্টিমার বা সমুদ্রভ্রমণ। আমাকে বলে দিয়েছিলেন, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থানকে তুমিই খবর পাঠাবে। প্রয়োজনে আমি 'অ্যাড' করবো।

কাগজগুলো নিয়ে জিতেনদার কাছে গেলাম। এক লহমায় দেখে আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। সকাল থেকেই আমাদের 'ওল্ডম্যানের' শরীর খারাপ। অফিসে ওঁকে অমোদের চাইতেও হৈ-চৈ করতে দেখেছি, ভেবেছিলাম বাইরে গিয়ে ওঁর ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই মানুষটি এমন শান্ত কেন? রা কাড়ছেন না কেন? এতক্ষণে আসল ব্যাপার জানলাম। ওঁর জীবনে 'সী-সিক'এর ঘটনা আগেও ঘটেছে। পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে খেয়ে নিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বমি হয়ে গেল। 'দশরথের' ডাইনিং রুমের টেবিলে শুইয়ে দিলাম। ওঁর চোখ মুখ লাল। আমার খুব ভয় হল। কম্যাণ্ডার দাশের পরামর্শ নিলাম। গঙ্গায় এই অবস্থা, এরপর সমুদ্রে পড়লে ঢেউ বাড়বে। তখন ওঁকে সামলানো যাবে না। জিতেনদাও স্থির করলেন, ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে কলকাতায় ফিরবেন।

বাইরে তখন নদীর তীরে কয়েকশ' লোক। ওরা ডিউক-পিনাকীকে দেখতে এসেছেন। বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেলেন। নৌকোয়

চড়ে লঞ্চের কাছে এসে ওদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করলেন কয়েকজন ছাত্র—'ডিউকদা, পিনাকীদা আপনাদের যাত্রা শুভ হোক, আন্দামানের ছাত্র ও যুবকদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন।' অটোগ্রাফ নিয়ে ওরা চলে গেল।

ইতিমধ্যে বিজন খবরের কাগজগুলো পাঁজাকোলে নিয়ে এসেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় গতকালের যাত্রা শুরুর খবর আর ছবি দেখিয়ে ডিউককে বলল, 'আমাগো তো পাত্তা দিবা না, দ্যাখো কি করছি।' ডিউক ফ্যালফ্যাল করে তাকালো পিনাকীর দিকে। পিনাকী বরিশালের ভাষার ইংরাজি অনুবাদ করল।

তখন দুপুর বারোটা। জিতেনদাকে বেশ চাঙ্গা মনে হল। ওঁর চোখ দুটো তখনও রক্তজবার মতো। তবুও হাসি ঠাট্টায় যোগ দিয়েছেন। আমার ডেসপ্যাচের কপিটা দিলাম। উনি নিজের ভাষায়, নিজের ভঙ্গীতে টাইপরাইটার নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ স্পীডে খটখট শুরু করলেন। জিতেনদা টাইপ করছেন আর বিজন ও আমার কাছ থেকে পয়েন্ট জেনে নিচ্ছেন। ডিউক পিনাকী কম্যাণ্ডার দাশের মতো অন্যরাও তখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, ঘুমুচ্ছেন। এদিকে জোয়ার এসেছে। দুই তীর যেন ছাপিয়ে ঘোলা জল। আকাশ মোটামুটি পরিস্কার। দূরে বয়ার উপরে গাংচিলের ঝাঁক উড়ে উড়ে বসছে। ভাঁটা হলে আবার আমাদের যাত্রা শুরু।

কে যেন একজন পরামর্শ দিলেন, এত কষ্ট সহ্যের পর কাজ করা অসম্ভব। ডেসপ্যাচ ভাল হবে না। জিতেনদা এক ধমকে তাকে ফেরৎ পাঠালেন, আরামের জন্য আমাদের পেশা নয়। ওই দুই বেচারার (ডিউক-পিনাকী) কথা ভাবুন তো!

রাতেদিনে পার্থক্য থাকবে না। রোদ্র, বৃষ্টি মাথায় করে, প্রাণ হাতে নিয়ে কেন যাচ্ছে, কার স্বার্থে? ওরা এত কষ্ট সহ্য করবে, আর আমরা পারবো না? উনি আমার দিকে তাদিকে বললেন, এদের কথায় কান

দিও না। মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ মানুষ ডিউক-পিনাকীর খবরের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তাদের উৎকণ্ঠা নিরসনের দায়িত্ব আমাদের উপর।

জিতেনদা আমার কপিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আর একবার পড়ে নাও। নতুন পয়েন্ট থাকলে অ্যাড করো। লিখলাম, 'হ্যাঁ, সাগরদ্বীপের পর এই তিন লঞ্চের একটিও যাবে না। এত ছোট যে,—যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। আমাদের মোহনা পর্যন্ত যেতে বড় লঞ্চ বা জাহাজ চাই। বিস্তারিত খবর পাঠানোও হয়তো সম্ভব হবে না। কারণ, সমুদ্রের আবহাওয়া ক্ষণেক্ষণেই বদলায়। আর সঙ্গী পুলিশ ওয়ারলেস তো এখনই কাজ করছে না। ওদিকে স্থলে নির্বাচন এগিয়ে আসছে, রিসিভিং সেণ্টারে ব্যস্ততা বাড়ছে। তবুও আমি আশাবাদী। ওয়ারলেস কাজ করুক—এটাই আশা করবো; যদি কাজ না করে, খবর পাঠাতে দেরিই হবে।'

দুপুরে খাবার টেবিলে শঙ্কর বললো, তাহলে স্বপ্নও সত্যিই হয়।

জিজ্ঞেস করলাম কেন?

—কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমার ছাড়া আর কারুর খবর কাজে লাগেনি। কী করে, কখন পাঠিয়েছিলে? তাতে কোন্ যাদু ছিল? আমার ডেসপ্যাচ কলকাতায় গিয়ে টেবিলে পড়ে রয়েছে। নাইট এডিটর 'ড্যাম ইট' বলে ফেলে রেখেছেন।

খবরের কাগজগুলো দেখে বুঝেছিলাম, শঙ্করের স্বপ্ন সফল হয়েছে।

আমার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারির প্রথম পুরস্কার পাওয়ার স্বপ্ন। আমার নাম না উঠলেও এক বান্ধবীর নাম দেখে উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু ফটো ও ঠিকানা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। নাম ও পদবী ছাড়া বান্ধবীর সঙ্গে আর কিছুরই মিল ছিল না। দু' লাখ টাকার স্বপ্ন, আশা সব মাটি, 'ধ্যুৎ' এর পর

আর কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। সামনে পিতৃসম জিতেনদা। বাধ্য হয়ে থামতে হল।

বেলা ছুটোয় 'অ্যাডমিরাল কানোজি আংরে' আবার চলা শুরু করেছে। আকাশ পরিস্কার, কড়া রোদ্দুর। নদী শান্ত। বাঁ তীর দিয়ে ওরা এগোচ্ছে। 'গণেশ' আর 'দশরথ' এক সঙ্গে বাঁধা। হাঁটি-হাঁটি পা-পা চলছে। আমরা কয়েকজন সাংবাদিক 'ন্যান্সি' নিয়ে একটু দ্রুত এগোচ্ছি। ডায়মণ্ডহারবারে আগে যেতে চাই। কিছু ফিল্মের প্রয়োজন বিজনের। আমিও ঠিক করেছি ওয়ারলেসের উপর নির্ভর না করে অন্য চ্যানেল দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিই। গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারলে অবশ্য তারও প্রয়োজন হবে না। জিতেনদার হাতেই পাঠানো যাবে।

দূরে ডায়মণ্ডহারবার দেখতে পাচ্ছি। 'সাগরিকা' সহ অন্য বড় বাড়িগুলো ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমরা পৌছালাম প্রায় সাড়ে তিনটেয়। জেটিতে তখন হাজার হাজার কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। কলকাতা থেকেও দলে দলে অনেকে এসেছেন। এসেছেন বিভিন্ন ক্লাব ফেস্টুন নিয়ে লরী করে, বাস রিজার্ভ করেও কেউ কেউ—আন্দামান অভিযাত্রীদ্বয়কে অভিনন্দন জানাতে। এছাড়া শীতের রেশ না কাটা ছুটির দিনে (রবিবার ছিল সেদিন) ডায়মণ্ডহারবারে অসংখ্য পিকনিক্ পার্টি তো ছিলই। স্থানীয় অধিবাসীরা শুধু নয়—দক্ষিণ পারের মেদিনীপুর জেলার মানুষও এসেছেন নৌকো ভাড়া করে বা লঞ্চ নিয়ে। কারুর হাতে ফুলের মালা, কেউ এনেছেন কাঁসর-ঘণ্টা, বিউগিল ব্যাণ্ডও এসেছে। কিন্তু বাজছে না। অধীর আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষা করছেন, ওদের জন্য। জেটির কাছাকাছি প্রায় আধ-মাইল জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। গতকাল কলকাতায় ম্যান-ও-ওয়ার জেটিতে এত ভিড় দেখিনি। জেটির পাশে অপেক্ষামান অশীতিপর এক স্থানীয় বৃদ্ধ বললেন, তিনি ডায়মণ্ডহারবার তীরে কখনও

এমন লোকারণ্য দেখেননি। সুদূর গ্রামের মানুষকেও এত উৎসাহে ও কৌতুহল ভরে তো কখনও আসেন নি।

উপয়ে গিয়ে কলকাতার অফিসে টেলিফোনে যোগাযোগ করে মোটামুটি অবস্থাটা জানালাম—গঙ্গাতেই ওদের গতি এত কম যে মোহনায় কবে পৌছোব তা নিশ্চিন্ত করে বলতে পারছি না। সহকর্মী সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় টেলিফোন ধরেছিলেন। তাঁকে বললাম—আমাদের কর্মসূচী রদবদল হবেই, বার্তা সম্পাদককে জানিয়ে রাখবেন।

—খবর পাঠাবার সব ব্যবস্থা করেছেন তো, আজ অন্য কাগজে কোন ডেসপ্যাচ আসে নি।

—ওসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। রাত দশটার মধ্যে যে কোন উপায়ে খবর পাবেনই।

ডায়মণ্ডহারবারের এক চায়ের দোকানে বসেছিলাম। হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। 'ওরা এসেছে, ওই যে নৌকো, ওই আসছে।' ছুটোছুটি পড়েছে আবাল বৃদ্ধ মহলে। সকলে ছুটে চলেছেন জেটির দিকে—'সাগরিকার' কাছাকাছি। 'কানোজি আংরে' ওখানেই নোঙর করবে, কিছুক্ষণ ওখানেই বিশ্রাম নেওয়ার কথা ডিউক-পিনাকীর।

কাঁসর, ঘণ্টা, বিউগিল, ব্যাণ্ড, 'হিপ হিপ হুররে', ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ'-এ গঙ্গাতীর মুখর। ৪টা ২০ মিনিটে 'কানোজি আংরে' জেটিতে ভিড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে জেটি ভেঙে পড়ার উপক্রম। পুলিশ আছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। হয়তো ওঁরা বুঝতে পারেন নি—এত ভিড় হতে পারে। 'দশরথ', 'গণেশ', 'স্যাপ্সি' তিনটে লঞ্চে লোক ঢুকে পড়েছে—ডিউক-পিনাকীকে তারা দেখতে চান। শুভকামনা করবেন এই দুই দুঃসাহসীকে। জনতা উদ্বেলিত। সব বাধা ভেঙে, সব নিষেধ উপেক্ষা করে তারা খুঁজছেন অভিযাত্রীদের। মিহির সেন কখন পৌছেছিলেন দেখিনি। জেটির ভিড়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র উপেন তরফদার আর প্রণবেশ

সেন আমাকে পাঁজাকোলে তুলে ধরলেন। অস্পষ্ট একটু দেখলাম, মিহিরদা জনতার সঙ্গে ওদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এই অবস্থাতেই ওপার থেকে এক নৌকো বোঝাই মহিলারা এসেছেন শাঁখ বাজাতে বাজাতে। হাতে পূজোর ফুল, প্রসাদ। হামাগুড়ি দিতে দিতে কোনক্রমে জেটিতে উঠেছেন। 'বাবাসকল সেই দামাল ছেলে দুটোর কাছে নিয়ে চলো। বাবার প্রসাদ দেব ওদের। তারকেশ্বরের প্রসাদ।' কে যেন বলে দিলেন আমায় দেখিয়ে—'ইনিই পারেন, কাগজের রিপোর্টার'। বললাম, অধীর হবেন না। ওরা চার-পাঁচ ঘণ্টা থাকবে। ভিড় কমতে দিন।

এরই মধ্যে জিতেনদা বোচকা বুচকি নিয়ে প্রস্তুত। সঙ্গীও পেলেন কলকাতায় যাওয়ার। জুনিয়র স্টেটসম্যানের অভিজিত দাশগুপ্ত এসেছিল গাড়ি নিয়ে। অভিজিত চমৎকার ফটো তোলে। মোটর রেসে ওঁর জুড়ি বাংলা দেশে নেই। আমাদের ওল্ডম্যানকে সে কলকাতায় পৌঁছে দেওয়ার সব দায়িত্ব নিল। বলল, দেড় ঘণ্টায় কলকাতায় পৌঁছে যাবো। বিজন ছবির রোলগুলোও দিল ওর কাছে—আনন্দবাজারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

পিনাকীর মা-বাবাকে দেখলাম। তাঁরাও এসেছেন নিজের ছেলে পিন্টু ও পুত্রসম ডিউককে আশীর্বাদ করতে। এক প্রৌঢ়া ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ওদের। ডিউক মাথা থেকে ধান ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছিল' পিনাকী নিষেধ করল—হিন্দুরা এইভাবে মঙ্গল কামনা করে। অনেকে টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ডিউকের প্রশ্ন : মাঝ দরিয়ায় টাকা কোন্ কাজে লাগবে? পিনাকী আবার বুঝিয়ে দিল।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। সামান্য কুয়াশা। শীত শীত মনে হচ্ছে। জিতেনদা চলে গেলেন। চলে গেলেন এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের অশোক দাশগুপ্ত; ওঁর বাড়ি থেকে জরুরী খবর এসেছে।

নদী তীরের ভিড় কমলেও তা খুবই সামান্য। ডিউক-পিনাকী বিশ্রাম

নিচ্ছে ; কম্যাণ্ডার দাশও। মিহিরদা'র সঙ্গে আমরা সাংবাদিকরা জরুরী একটা বৈঠক করে নিলাম। মাঝপথের হালের গোলমাল, পুলিশের ওয়্যারলেস ইত্যাদি নিয়ে কথা হল। কর্মসূচি পরিবর্তন হবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, মোটামুটি আগের প্রোগ্রামই অনুসরণ করা হবে। প্রয়োজনে পরে বদলানো হতে পারে।

রাত নটা। খাওয়ার পর শঙ্কর ও আমি আবার শহরে গেলাম। দিনের শেষ খবর পাঠাতে। জানিয়ে দিলাম—আজ রাত বারোটায় নৌকো ছাড়ছে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। হলদিয়ায় পৌঁছোব কাল সোমবার ভোরে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাগরে, ৫ই ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে স্যাণ্ডহেডসের (মোহনা) কাছাকাছি, আর ৬ তারিখে স্যাণ্ডহেডস।

জেটিতে ফিরতেই অদূরে থানার পেটা-ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা শুনলাম। কাল থেকে ধকল যাচ্ছে। ঠিকমত ঘুম কারুর হয়নি। 'দশরথের' কেবিনে পাশাপাশি আমি, বিজন ও শঙ্কর শুয়ে। পাশের একটি কেবিনে উপরে ও নিচে ডিউক-পিনাকী, আর একটিতে দশরথের ভারপ্রাপ্ত অফিসার কৃষ্ণধনবাবু ও কম্যাণ্ডার দাশ। ওঁরা চারজন অনেক আগেই লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিজন ও শংকরের নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে। আমি পট হোল্ খুলে 'ক্যানোজি আংরে'কে দেখতে লাগলাম। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। আরও অস্পষ্ট উপরে জেটির প্রবেশ মুখটা। ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে। কেবিনের ভিতরে ফুল স্পীডে পাখা চলতে থাকলেও গরমে আঁকুপাঁকু করছিলাম। ভীষণ অস্বস্তি। কিছুতেই ঘুম পাচ্ছে না। ওদিকে বারোটায় আবার যাত্রা শুরু। জোর করে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। লঞ্চের ডেকে উঠে পায়চারি শুরু করলাম। তারপর জেটিতে। উপরে রাস্তায় অত রাত্রেও রিক্সা যাতায়াত করছে, বিচুলির লরী চলে গেল সারিবদ্ধ হয়ে কলকাতার দিকে। দু চারজন লোকের আনাগোনাও আছে। কাছেই পুলিশ প্রহরা। ফিরে

দশরথের ডেকে ইজিচেয়ারে বসে ডিউক-পিনাকীর ভাবনায় মনটা বড় খারাপ লাগছিল—এই বোধ হয় ওদের শেষ যাত্রা। সমুদ্রে যদি কোন অঘটন ঘটে যায়; ওরা আর কোনওদিন স্থল দেখতে পাবে না।
হঠাৎ দেখি কে যেন জেটিতে ঘোরাফেরা করছেন। 'আমার ডিউক-পিনাকী কোথায়'? নারী কণ্ঠ শুনে উঠে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, মহিলাই। কিন্তু বৃদ্ধা না হলে প্রৌঢ়া তো বটেই!
—কি চাই আপনার?
—ওরা দুজন কোথায়?
—বিশ্রাম নিচ্ছে।
—ওদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।
—বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন। এখন ওদের ডাকা নিষেধ।
—না, বাপু। অতক্ষণ আমি থাকতে পারবো না। তুমি তাহলে ঠাকুরের এই পূজোর ফুল ওদের কপালে ছুঁইয়ে রেখে দিও। আচ্ছা তুমি কি মোহনা পর্যন্ত যাচ্ছ?
—হ্যাঁ। মোহনায় যাচ্ছি এপারের শেষ বিদায়-অভিনন্দন জানাতে।
—আরও ভাল হল; তখনই ওদের নৌকোয় ফুল দিও।
কিছুক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবার অনুরোধ ওদের দুজনকে একটু দেখার ব্যবস্থা করে দাও না! দূর থেকে দেখে চলে যাবো!
সারা লঞ্চ নিদ্রামগ্ন। কেবিনগুলো অন্ধকার। লাইট জ্বাললে ঘুমের ব্যাঘাত হবে ভেবে ভিতরে আমি আন্দাজের উপর ভর করে চলাফেরা করছিলাম এর আগে। কিন্তু ডিউক-পিনানীকে দেখাবার জন্য তো ওঁকে নিয়ে গেলে লাইট জ্বালতেই হবে! তাছাড়া প্রথম ফাঁড়া—বিজন ও শংকর।
উনিই বললেন, লাইট জ্বাললে ওদের অসুবিধে হবে ভাবছো! লাইটের

দরকার নেই। তুমি আগে আগে চলো, আমি পিছু পিছু যাচ্ছি। দূর থেকে ওদের মুখ দুটো দেখতে চাই। দেখে এক মিনিট ভগবানের কাছে ওদের জন্য প্রার্থনা করবো।

অনেকগুলো প্রশ্ন জাগলো আমার মনে। গতকাল দুপুর থেকে লঞ্চের আদ্যোপান্ত জেনেও ভিতরে অন্ধকারে চলতে ভয় পাই—কি জানি কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়বো। আর এই প্রৌঢ়া অন্ধকারে নির্ভয়ে যাবেন—কোথায় সিঁড়ি, কোথায় দরজা, কোথায় চেয়ার টেবিল ইত্যাদি না জেনে? ভাববার বেশি অবকাশও দিলেন না তিনি। 'চলো, তাড়াতাড়ি! দেরি হয়ে যাচ্ছে।' কেবিনের ভিতরে পট হোল্ দিয়ে বাইরের সামান্য আলো আসছিল। পিনাকীদের কেবিনের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ওদের কেবিনে ক্ষীণ সবুজ আলোটি জ্বলছিল। দুজনের মুখ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তিনি কিছু বলছেন মনে হল। তারপর নিঃশব্দে আমাকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর পিছনে আমি। জেটিতে নেমে নৌকোর দিকে যাচ্ছেন দেখে নিষেধ করলাম। শুনলেন না—গলুইয়ে কিছু ফুল রেখে বললেন—মোহনায় গিয়ে ওদের কপালে ছুঁইয়ে দেবে। ওদের কোন অমঙ্গল হবে না। যত বাধাই আসুক ওরা আন্দামানে পৌঁছে যাবে।

আমাদের তিনটি লঞ্চেরই কেউ বোধ হয় চেঁচিয়ে উঠেছেন—কে, কে ওখানে?

—আমি চিরঞ্জীব। সাড়া দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে কড়া টর্চের আলো পড়েছে ওই প্রৌঢ়ার গায়ে। উনি যেন উতলা হয়ে উঠলেন। ছুটে পালাতে ব্যস্ত; কিন্তু দিশেহারা। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হল। —দৌড়বেন না। এদিক ওদিক কাছিতে আটকে পড়ে যাবেন! কে কার কথা শোনে! উপর থেকে প্রহরী পুলিশের একজন ছুটে এলেন জেটির সিঁড়ি বেয়ে নীচের জেটিতে। তাঁরও হাতে টর্চ। কিন্তু সেই মহিলাকে আর দেখতে পেলাম না। কোথা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল

বুঝলাম না। 'মা গঙ্গার জয় হোক, ডিউক-পিনাকীর মঙ্গল হোক।' কোথা থেকে এসেছিলেন, হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন! হদিস পেলাম না।

সেই পুলিশকে পুরো ব্যাপারটা বলতে তিনি জানালেন, এই জেটিতে এমন ঘটনার কথা আগে শুনেছি। প্রতিবছর গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে কতজন যে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের বিদেহী আত্মার এখানে মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে।

তবুও বিশ্বাস হয় নি। আমার শরীরটা যেন পাথর হয়ে আসছিল। পুলিশ আফিসারটি সিগারেট ধরালেন। আমাকেও বিদেহীদের কেউ ভেবেছিলেন কিনা জানি না। সিগারেট অফারও করলেন। ধূমপানে আসক্তি না থাকলেও ওঁর সন্দেহ নিরসন করতে চারমিনার ধরালাম।

তারপর আবার ডেকের সেই ইজিচেয়ারে। গায়ে শুধু গেঞ্জি ছিল। খুলে দেখি গ্রীষ্মের দুপুরের মত অবস্থা—দর দর ঘাম ঝরছে। গত পনের কুড়ি মিনিটের ঘটনাটা আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা। চোখে মুখে জল দিয়ে কেবিনে গিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করলাম। ঘুমিয়েছিলাম কতক্ষণ জানি না। ঘুম ভাঙলো দেড়টায়। ঘড়ি দেখে আঁৎকে উঠলাম। বারোটায় যাত্রা শুরুর কথা। ওরা চলে গেল, আর আমি ঘুমুচ্ছি? ডায়মণ্ডহারবারের অগণিত জনতার বিদায় অভিনন্দন দেখতে পেলাম না?

আমার সব চিন্তা অমূলক। রাত বারোটায় নৌকো ছাড়ার কথা থাকলেও ওরা যাত্রা করেনি ঘন কুয়াশার জন্য। কিন্তু সাড়ে এগারটা থেকে আবাব জেটি ও উপরে রাস্তায় কাতারে কাতারে মানুষ এসেছেন এবং তখন দেড়টার সময়ও তাঁরা অপেক্ষা করছেন। অভিযাত্রীরা প্রস্তুত হয়ে নৌকোয় উঠলেন পৌনে দুটোয়। বিকালের মত এই শেষ রাত্রেও আবার 'ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ', শঙ্খ ও উলুধ্বনি, ব্যাণ্ড, কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। দুম্ দাম্ পটকা ফাটছে, হাউই উড়ছে। কয়েকঘণ্টা

আগের ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে দেখি 'কানোজি আংরে'র গলুইয়ে কয়েকটা ফুল, বেলপাতা ও দুর্বা রয়েছে। কুড়িয়ে এনে রেখে দিলাম কেবিনে। পরে ডিউককে ঘটনাটা জানাতে সে বলে, তুমি সাংবাদিক, এসবে বিশ্বাস করো? পরে ওর ভাবী স্ত্রী কোমল সচদেব অবশ্য ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

দুটোয় 'কানোজি আংরে' চলে গেলেও আমরা যাইনি। কম্যাণ্ডার দাশ বলে গেলেন, এই ঘন কুয়াশায় লঞ্চ ছাড়া উচিত হবে না। গঙ্গায় প্রবল স্রোত, ভাঁটা। যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

নৌকো চলে যাওয়ার আধ ঘণ্টা পর শঙ্কর হুড়মুড় করে উঠে বললো, কী ব্যাপার, কী দেখছো? নৌকো কোথায়, 'কানোজি আংরে'? আমরা রয়েছি অথচ নৌকো নেই! নৌকো চুরি হয়ে যায়নি তো?

—চুরি হবে কেন? বললাম আমি।

—চুরি হওয়াই স্বাভাবিক। এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের বিরোধিরা এবং যারা পিনাকীকে সমুদ্রে যেতে দিতে চান না তাঁরা নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারেন বা দড়ি খুলে গঙ্গার স্রোতে ছেড়ে দিয়েছেন! ওরা তিনজন—ডিউক-পিনাকী ও কম্যাণ্ডার দাশ তো নেই!

—তা হলে ওরা নৌকো নিয়ে চলে গিয়েছে নিশ্চয়ই, বললাম।

—কিন্তু আমাদের রেখে কেন?

শঙ্কর 'দশরথের' ভারপ্রাপ্ত অফিসার কৃষ্ণধনবাবুর স্মরণাপন্ন হয়ে সব ব্যাপার অবহিত হল। সে যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—একটা লীড স্টোরি মিস্ করলাম চিরঞ্জীব। লীড স্টোরি।

—কেন?

—নৌকো চুরি যাওয়াটাই তো খবর হোত!

'দশরথের' ইঞ্জিনীয়ার বললেন, আপনারা বড় নিষ্ঠুর। সব সময় অমঙ্গল কামনা করেন।

—নিষ্ঠুর নয়, একেবারে পাষণ্ড। কোন মন্ত্রী অসুস্থ শুনলেই জীবনী

তৈরী করে রাখা হয় কাগজের অফিসে। কোন অ্যাকসিডেণ্ট হলে হাসপাতাল বা পুলিশকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করি ক'জন মরেছে। না মরলে অ্যাকসিডেণ্টই নয়। শুধু আহতে খবর হয় না, নিহত চাই।

হলদিয়ার পথে

আজ ৩রা ফেব্রুয়ারি। এখন সাতটা। আমরা ডায়মণ্ডহারবারে রয়েছি—কুয়াশার জন্যই। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে খবরের কাগজগুলো এসে পৌঁছেছে। ডায়মণ্ডহারবার রেল স্টেশনে কালোবাজারে বাংলা কাগজ বিক্রি হচ্ছে আন্দামান অভিযানের খবরের জন্য। সব কাগজেই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি সহ বিস্তারিত সংবাদ। আনন্দবাজারে আমার পাঠানো সংবাদ শিরোনাম 'হলদিয়ার পথে'। সাড়ে সাতটায় প্রথম সূর্যের আলো দেখতে পেলাম। কুয়াশাও কিছুটা কেটে গিয়েছে। 'দশরথ' ও 'গণেশ' চলে গেল। তারপর আমাদের 'ন্যান্সি' ছাড়লো আটটায়।

বলতেই ভুলে গিয়েছি। জিতেনদা চলে গেলেও আমরা সংখ্যায় ঠিকই আছি। স্টেটসম্যানের মানস ঘোষ এসেছে। দিল্লী প্রবাসী বাঙালী তরুণ। কয়েক বছর হল চাকরীর সুবাদে কলকাতার নাগরিক। চমৎকার ছেলে। ছয় ফুট লম্বা। ভীষণ ফর্সা। আমাদের দলের কনিষ্ঠতম। কাল সন্ধ্যে থেকেই সে সকলকে 'গুরু' সম্বোধন শুরু করেছিল। 'আর যাই করো, ল্যাং মেরো না, ডুবিও না গুরু।' বিজন উত্তর দিয়েছিল, আমার, শঙ্কর ও মানিকের পক্ষে—মাইনা চইলো,

সব খবর পাইবা, তুমি স্টেটসম্যানের একজন প্রমিজিং রিপোর্টার, তোমারে ডুবামু ক্যান্!

বিজন আজ সকালে 'দশরথেই' থেকে গিয়েছিল। আমাদের 'ন্যান্সি' ফুল স্পীডে কয়েক ঘণ্টা চললো। কিন্তু 'দশরথ', 'গণেশ' বা 'কানোজি আংরে'র পাত্তা পাচ্ছে না।

গঙ্গায় ইট, কাঠ, পাট বোঝাই নৌকো, মাঝে মাঝে জেলেদের জাল। নদীর ডান তীরে দেখতে পাচ্ছি, বাঁ তীরের গাছগুলো যেন জলে ভাসছে। 'ন্যান্সি'র সারেং আমাদের ব্যস্ততা দেখে বললেন, ডিঙি তো এবেলা হলদিয়ায় থাকবে। জোয়ারে এগিয়ে যেতে পারবে না।

আমরা অবশ্য ওদের হলদিয়া পৌছোবার আগেই ধরে ফেললাম।

এখন ১০টা ৫ মিনিট। আমরা হলদিয়ার কাছে। দূরে তৈল শোধনাগারটি দেখতে পাচ্ছি। জোয়ার শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে হাওয়া এবং ঢেউ। সেই ঢেউয়ের উপর-জলে গাং চিলগুলো চুপটি করে বসে। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে তারা। গান গাইতে ইচ্ছে করছে— "ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে···।"

হলদিয়ায় পৌঁছে কমঃ দাশের কাছে শুনলাম, সওয়া সাতটায় ওরা বেলারি পৌঁছে জল নোঙর ফেলেছিলেন। 'দশরথ' তন্ন তন্ন করেও ওদের হদিশ পায়নি। কারণ, জল নোঙর ফেললেও পাঁচ মাইল ওরা স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ায় ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। ডায়মণ্ডহারবার থেকে আটমাইল এইভাবে এগিয়েছে। বাকি ছয় মাইলের কখনও ঘুমিয়েছে, কখনও দাঁড় বেয়েছে। নৌকো একবার হলদিয়া থেকে চার মাইল দূরে থাকতে হলদিয়ার তীরে চলে যায়। তীরে ছিল কয়েকটা কুকুর। কুকুরগুলো এদের দেখে কী ভেবেছিল কে জানে! ঘেউ ঘেউ আরম্ভ করে। তখন একবার ওদের ঘুম ভাঙে। তারপর আবার জাগে 'দশরথের' ডাকে—ঘন ঘন হুইশিলের শব্দে।

কলকাতা থেকে আমরা এখন ৫৬ মাইল দূরে। ডায়মণ্ডহারবার ছিল নদীপথে ৪২ মাইল, আজ এসেছি আরও ১৪ মাইল।

এতদূরে এসেও নিস্তার নেই। ডিউক-পিনাকীর খবর হলদিয়াতেও পৌঁছেছে। জনা পঞ্চাশেক যুবক (কেউ ছাত্র, কেউ বা হলদিয়ায় চাকুরিরত) ফুল আর শুভেচ্ছা নিয়ে এলেন। কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হল—তাঁরা মেদিনীপুর থেকে বাসে আজ সকালে এখানে এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। ফুল নিয়ে এসেছিলেন হলদিয়ার চিরঞ্জীবপুর গ্রামের তরুণরা।

সাড়ে বারোটার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ, বিশ্রামও। সওয়া একটায় যাত্রার আগে পিনাকী গান শুনিয়ে গেল—'আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া যবে'…

হলদিয়াকে পিছনে ফেলে আসতে কয়েকঘণ্টা কেটে গেল। মনে হল হলদিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, কলকাতা আমাদের 'পশ্চাতে টানিছে'। এখন পৌনে পাঁচটা। আমরা 'গনেশে' রয়েছি। সুযোগ বুঝে ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠাবো বলে। সূর্য অস্তাচলে যাবে কিছুক্ষণ পরে। পশ্চিমাকাশ রক্তিম। 'গণেশের' সারেং বড়ুয়াবাবু 'রানিং কমেন্টারি করছিলেন—'এবার আমরা ঝাউখালির কাছে। বাঁক ঘুরলেই মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত রসুলপুর গ্রাম। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা রচিত হয়।' বাঁদিকটায় দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নদীর জলে নানা স্রোত। উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। ওদের এখন নীড়ে ফেরার পালা।

দুরন্ত সূর্যের হঠাৎ শেষ কিরণে সারা আকাশ উদ্ভাসিত করার অন্তিম চেষ্টা। একটি অগ্নিপিণ্ড থেকে যেন আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, পশ্চিম আকাশে। ইতিমধ্যে এমন এক জায়গায় এসেছি—যেখানে নদী একেবারে শান্ত। ঢেউ নেই, স্রোতও না। মনে হচ্ছিল, একটি বড়

পুকুরে আমরা লঞ্চের উপর বসে। সমুদ্র এমন শান্ত থাকলে আন্দামান পৌঁছোতে ওদের কোন বেগ পেতে হবে না।

পরক্ষণেই আবার অন্য ভাবনা। আজ তবুও নদীর দুই তীর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তারপর? সামনে অকুল বারিধি। জল আর জল। সব জল লবণাক্ত। সেই জলে এমন সব হিংস্র জন্তু রয়েছে, যার খবর আমরা রাখি না। একটা কথা বারংবার মনে হচ্ছিল: আন্দামান অভিযানে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার রথীন দাশকে নিয়ে তিনজন সদস্য হলে বেশ ভাল হত। আরও বলতে ইচ্ছে করছে—ওরা যখন সমুদ্রে থাকবে, তখন যেন জাহাজ বা বিমান নিয়মিত খবর রাখাব ব্যবস্থা করে। সরকারের পক্ষ থেকেই এসব বন্দোবস্ত হোক।

এখন পাঁচটা। ঝিরঝিরে হাওয়া। পদ্মনাভনের খুশিভরা চীৎকার—ওয়াণ্ডারফুল। তারপরই জোর হাওয়া। ঝড় নয়তো? বড়ুয়া—উঁহু। এখন জোয়ার শুরু হবে।

বাঁদিকে দূরে সাগরদ্বীপ ও কপিলমুনির মন্দির দেখা যাচ্ছে। সবে অকল্যাণ্ডে পড়েছি। 'কানোজি আংরে' বেশ দ্রুত এগুচ্ছে। এমন স্পীডে গেলে হয়তো ৩০ বা ৭০ দিনে ওরা আন্দামানে পৌঁছে যাবে। ওরা পৌনে ছয়টা পর্যন্ত দাঁড় বাইল। আজ দুপুরের পর এক নাগাড়ে সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি দাঁড় টেনেছে। কর্ণধার কমঃ দাশ বললেন—বেস্ট পারফরমেন্স। আমরা এখন অকল্যাণ্ডে—কলকাতা থেকে ৭২ মাইল দূরে।

সম্ভবত আবার চলা শুরু মাঝরাতে। আজকের খবরের এখানেই ইতি টানতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে: আগামী রবিবার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচন। ডিউক অন্য রাজ্যের লোক। কিন্তু পিনাকী তো পশ্চিমবঙ্গের। পিন্টু ভোট দেবে কী করে? মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস, পি, সেনবর্মা যে বলেছিলেন, সকলেই ভোট দিতে পারে এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি পিনাকীর

ভোট নিতে কি জাহাজ পাঠাবেন? আর একটা কথা: ডিউক-পিনাকী এখনও আমাদের সঙ্গে আমাদেরই মত আহার্য গ্রহণ করলেও কাল থেকে আর ভাত, ডাল, তরকারি, চচ্চড়ি বা এই ধরণের অন্যসব জিনিস পাবে না। টিন্‌ডফুড, ড্রাই ফুড খাওয়া শুরু করবে।

কমঃ দাশ সম্পর্কে গত দু দিনের ধারণা আজ মুহূর্তে পালটে গেল। ডান হাতে বালা, চেহারা ও রং দেখে ভেবেছিলাম, তিনি অবাঙালী এবং দক্ষিণ ভারতীয়। পদবীতে মনে হয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা উড়িষ্যার মানুষ। কিন্তু অকল্যাণ্ডে পৌঁছে একটি লাইটি হাউস দেখিয়ে যখন বললেন, "লাইট হাউস দেইখতাছেন না?" বুঝলাম উনিও কাঠ বাঙাল। "দ্যাশ আছিলো ঢাকা জিলায়।"

বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডারদের যে এমন ঠাণ্ডা মেজাজ হয় এই প্রথম জানলাম। অমায়িক ব্যবহার ছোটবড় সকলের সঙ্গে। কোন কাজে একটুও ক্লান্ত হন না। বরং কাজ করতে করতে ওঁর উৎসাহ আরও বেড়ে যায়!

ডিউক-পিনাকীর মতই আন্দামান অভিযানের সঙ্গে আর যাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে—তিনি এই রথীন দাশ। কলকাতার ম্যান ও' ওয়ার জেটি থেকে মোহনা পর্যন্ত দীর্ঘ বন্ধুর পথে 'কানোজি আংরে'র কর্ণধার ছিলেন ইনি। হুগলি তথা গঙ্গার প্রবল স্রোতই ছিল এই ছোট ডিঙির পক্ষে বিপজ্জনক। ১লা ফেব্রুয়ারি তিনি কলকাতা থেকে যে হাল ধরেন, তা ছাড়েন ৬ই ফেব্রুয়ারি ভোরে মোহনা (স্যাণ্ডহেডস্) থেকে আরও ছয় মাইল দূরে ওদের পৌঁছে দিয়ে। এই পথ 'কানোজি আংরে' ভাঁটার টানে এগিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হাওয়া ওদের পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অনুসরণকারী লঞ্চ মাঝে মাঝে তাই বাধ্য হয়ে ওদের জন্য নোঙর করে দাঁড়ায়। ডেকের উপর থেকে দূরবীণে দেখেছি, মাস্তুলের পতাকা প্রচণ্ড হাওয়ায় ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম, নৌকো বেশ দুলছে ঢেউয়ের মাঝে পড়ে, মাস্তুল ও পতাকা

ছাড়া আমরা আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা—এই প্রতিকূল অবস্থায় লেঃ কঃ দাশের নৌ-চালনার গুণে এবং ডিউক-পিন্টুর চার বাহুর শক্তিতে এগিয়েছে নৌকো। এমন অবস্থায় পড়েও ওরা যখন লঞ্চে এসেছে বিশ্রাম নিতে—লক্ষ্য করেছি অভিযাত্রীদের ট্রাক-স্যুটে একটুও জল লাগেনি। এ কী করে সম্ভব? জবাব দিয়েছে ডিউক: ডিউ টু কম্যাণ্ডার দাশ।

মোহনা পর্যন্ত ছয় দিনে তিনিই ওদের শিখিয়েছেন কতক্ষণ দাঁড় টানতে হবে, কতক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে, কখনই বা খেতে হবে। ডিউক নৌ-বাহিনীর অফিসার, পিনাকীও ট্রেনিং নিয়েছিল; তবুও কম্পাস, ওয়ারলেস ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার ও মেরামতের সব কাজ আবার শিখিয়ে দিয়েছেন কম্যাণ্ডার দাশ। বলেছেন, হাওয়া ও স্রোত বিপরীতমুখী হলেও কিভাবে কম পরিশ্রমে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

ওই ছয় দিনে লেঃ কঃ দাশকে কখনও পরিশ্রান্ত মনে হত না। রাত দশটায় শুয়ে আবার দুটোয় উঠেছেন, ডিউক-পিন্টুর আগেই। চা-পানের পর নৌকোয় নেমে হালে বসেছেন। শেষদিকে হাল মেরামত, কম্পাসের কাঁটা মেরামত, ওয়ারলেস চালু, মোহনা থেকে এপারের শেষ বিদায়ের আগে আর একবার অভিযাত্রীযুগলকে ম্যাপটি ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সব দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। এক্সপ্লোরার্স ক্লাব আন্দামান অভিযানের উদ্যোক্তা কিন্তু নৌকো ছাড়ার পর ক্লাবের সদস্য লেঃ কঃ দাশ হয়েছেন নেপথ্য নায়ক-কাণ্ডারী।

ডিউক-পিন্টুর আন্দামান পৌছান সম্পর্কে সবচেয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন তিনিই। তবে সপ্তাহকাল ওদের অনুসরণ করতে করতে মনে হয়েছে, আন্দামান পর্যন্ত এই অভিজ্ঞ নাবিক হাল ধরে থাকলে ওদের হয়তো ম্যাপ, কম্পাস, ওয়ারলেস কিছুই দরকার হত না। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই লেঃ কম্যাণ্ডারের পাইলট-জীবন গৌরবময়।

ডাফরিনের ছাত্র,পাইলট হন সাতান্ন সালে। বাষট্টিতে চীন-ভারত সংঘর্ষ কালে নৌবাহিনী থেকে ডাক পড়লেও কর্মস্থল ছিল হুগলিতেই। পয়ষট্টিতে পাক-ভারত যুদ্ধে আবার ডাক পড়লো। রথীন দাশ ছিলেন একজামিনেশন অফিসার। বিদেশী বন্দর থেকে কলকাতায় যে সব জাহাজ আসত, তার কর্মীদের পাশপোর্ট পরীক্ষা করতেন, কারা নতুন এসেছেন দেখতেন। লক্ষ্য ছিল, কেউ গুপ্তচর বৃত্তি করতে এসেছে কিনা ইত্যাদি। দুই বছরের মধ্যে প্রমোশন (লেঃ কম্যাণ্ডার) পেলেন। তারপর আবার পোর্ট কমিশনার্সের কাজে ফিরে এসেছেন। কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত নদী ও সাগরের কোথায় কত জল তা ওঁর নখদর্পণে। তাঁর মত অভিজ্ঞ পাইলট কলকাতা বন্দরে আপাতত দ্বিতীয় জন নেই।

শেষরাতে অকল্যাণ্ডে

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী অকল্যাণ্ড থেকে নৌকো ছাড়লো রাত একটায়। ওদের শুভকামনা জানিয়ে আমরা বিশ্রামের জন্য কেউ কেবিনে, কেউ বা ডাইনিং রুমে, আর কেউ কেউ ডেকের ইজি চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছি প্রায় সকলেই। পৌনে তিনটেয় হঠাৎ যেন পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। এক্ষুণি সকলকে বড় জাহাজ 'নদীয়া'-য় চলে যেতে হবে, নির্দেশ দিয়েছেন 'দশরথের' অফিসার। বিজন ও আমার সবচেয়ে বেশি ঘুম পেয়েছিল। আমরা জেগে দেখি শঙ্কর, মানস, পদ্মনাভন, মানিক 'দশরথ' ছেড়ে চলে গিয়েছে তল্পিতল্পা নিয়ে। 'ন্যান্সি' রওনা হয়েছে কলকাতার দিকে। 'দশরথের' পাশে তখনও 'গণেশ' বাঁধা।

ঘুম চোখে কোনরকমে বিছানাপত্র বেঁধে নিলাম আমরা দুজন। কাজটা বেশি করেছিল বিজন। বাইরে তাকাতে দেখি দূরে বড় আরও একটি জাহাজ। আলো দেখেই বুঝেছিলাম। 'নদীয়ার' মোটর বোট সাংবাদিকদেব পারাপার করছিল। অকল্যাণ্ডের অকুল দরিয়ায় প্রচণ্ড ঢেউ। আকাশ ভরা তারা।

এত রাত্রে স্থান বদল কেন? 'দশরথের' এক কর্মী বললেন, আমাদের অর্থাৎ 'দশরথের' নিজস্ব ওয়ারলেস কাজ করছে না।

অভিযানের মার্শাল অমর চ্যাটার্জি তখনও ব্যাপারটা জানতেন না। তিনিও অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। পরে এসে 'দশরথের' ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে কিছুটা বচসা করলেন, আমাকে না জানিয়ে আপনি কাউকে ট্রান্সফার করতে পারেন না। কলকাতা থেকে নির্দেশ না পেলে আমি কোনও সিদ্ধান্ত নেব না। 'দশরথ' থেকে যাদের 'নদীয়া'য় পাঠানো হয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনুন।

পুলিশ ওয়ারলেস কলকাতায় মিহির সেনের কাছে খবর পাঠাল সমস্ত ঘটনা জানিয়ে। তক্ষুনিই উত্তরও চাওয়া হল।

বিজন আমাকে ধমকে বলল, 'দশরথের' ওয়ারলেস কাজ করছে না। রামনগরের (পোর্ট কমিশনারের কন্ট্রোল স্টেশন) সঙ্গে 'দশরথের' যোগাযোগ না থাকলে 'দশরথের' যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে। 'মিলিটারিতে ছিলাম, বুঝি কত ডিফিকাল্টিজ, কৃষ্ণধন বাবু ঠিক কইছে।' পরক্ষণেই 'গণেশে' পুলিশের ওয়ারলেস দেখিয়ে বলল, 'নদীয়ায়' যাইতেই হইবো, ওখানে ওয়ারলেসের সুযোগ পাইবা না। শেষ খবরডা পাঠাইয়া দ্যাও। ও শালারা চইলা গেছে, তোমার স্কুপ হইয়া যাইবো। না ঘমাইয়া কাজ করো। কাজের লাইগাই তো আইছো।

লাইন দশেক খবর লিখে ওয়ারলেসের কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। গত রাত্রে সকলের ডেসপ্যাচ চলে গিয়েছে। পড়ে আছে স্টেটসম্যানের

মানসের খবরটি। একটি লাইনও ওঁরা পাঠান নি। আমার নতুন ডেসপ্যাচটি ওঁরা নিলেন। আমার সামনেই তা কলকাতায় চলে গেল। মানসের খবর যায়নি কেন জিজ্ঞাসা করিনি।

পরে মার্শালের নির্দেশে শঙ্কর, পদ্মনাভন, মানস প্রমুখ 'নদীয়া' থেকে ফিরে এলে মানসকে তার খবর না যাওয়ার খবরটি দিতেই সে যেন ভেঙে পড়ল। বুঝতে দেরি হল না, ওয়ারলেসের সঙ্গে গত রাত্রের ঝগড়ার ফল এটি। অবশ্য ওরও কিছুটা গাফিলতি ছিল। ওয়ারলেসে গোলমাল দেখে আমরা কেউ কেউ সারাদিন ধরে টুকরো টুকরো খবর পাঠিয়েছি, মানস স্টোরি ফাইল করে রাত সাড়ে দশটার পর, তাও এক সঙ্গে সাড়ে সাত শ' শব্দ। পুলিশ ওয়ারলেস আপত্তি জানিয়েছিলেন, আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, সব পাঠানো হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু বিজন ও অমর চ্যাটার্জি ওই নিয়ে বচসা করতেই ওঁরাও কিঞ্চিৎ চটে যান।

গতকাল এই বচসার পর নাকি পুলিশের অধিকাংশ মিলে সিদ্ধান্ত নেন 'আনন্দবাজারের ডেসপ্যাচও যাবে না।' অবশ্য আমি সকলের সঙ্গেই খাতির বজায় রেখেছিলাম। ওয়ারলেসে আমার আসল নামের সঙ্গে মিল পাওয়া সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, মিতার দেওয়া খবর কি বন্ধ রাখন্ যায়?

আকাশে তারা কমে গিয়েছে। চারটে বাজে। 'দশরথের' ডেকে আমার কাছে পদ্মনাভন। কথা বলতে বলতে—কাকুতি মিনতি করতে করতে সেই একঘেয়ে—সিগারেট প্লীজ!

—সিগারেট তো খাইনা, বললাম আমি।

শঙ্করের কৌটো থেকে 'ডবল এক্স' নস্যি এনে দিলাম। পদ্মনাভন নাকে ভরে দিয়ে এমন হাঁচি শুরু করলো যে উল্টো ব্যাপার হয়ে গেল। জিতেনদার মতই ডাইনিং টেবলে শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে, বুকে মাথায় জল দিতে হল।

তবুও সে দড়। পনের মিনিটের মধ্যে আবার বকবকানি শুরু। বাংলায় দু-চারটে গালাগাল দিলাম। বিজন এসে—ওডারে জলে ফেলাইয়া দ্যাও। পদ্মনাভন তখনও আমাদের পিঠ চাপড়ে বলছে—মাই গ্রেট ফ্রেণ্ডস্।

—আচ্ছা কুরচুণ্ডু আকাশ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা?

—ইউ মিন স্কাই? খুবই নলেজ আছে। কি জানতে চাও?

—ওই বড় তারাটার নাম কী?

—ভেরি ইজি। পোল স্টার।

—বাংলায় বল।

—ধ্রুব তারা। আই অ্যাম নট্ এ বুদ্ধু।

সারারাত হুলুস্থুলের মধ্যে কাটলেও আর ঘুম হল না। ওরা যেমন হুড়মুড় করে 'নদীয়ায়' চলে গিয়েছিল, তেমনি দুমদাম চলে এল। এরই মাঝে কে যেন একটা হোল্ডল ফেলে এসেছে 'নদীয়ায়'। শঙ্কর মনিব্যাগ পাচ্ছে না। মোটর বোটে আবার চলে গেল। ভোর হয়েছে। 'কানোজি আংরে' তখনও হেলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে সাগর পানে। বায়নাকুলারে ওদের দেখে নিলাম। জোয়ার শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। তবুও ওরা দাঁড় বাওয়া বন্ধ করেনি। প্রোগ্রাম মিলিয়ে নিলাম—এতক্ষণ ওদের ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা। তবে কি ভুলে গেল? প্রথমে 'দশরথের' ছাদে উঠে চীৎকার করলাম। দুই হাতে রঙীন জামা নিয়ে সিগন্যাল দিলাম ফিরে আসার। কম্যাণ্ডার দাশ উত্তর দিলেন। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। ইতিমধ্যে হোল্ডল আর মনিব্যাগ নিয়ে শঙ্কররা ফিরে এসেছে।

একবার মোটর বোটটায় চড়ে আমরা বেড়িয়ে আসি। মানসটা একেবারে ভীতু। 'না বাবা আমি যাচ্ছিনা। এই ঢেউয়ে যদি বোট উল্টে যায়?' ও নৌকোয় উঠল না, সঙ্গে লাইফ বেল্ট নিলাম, তবুও না। দুটি কাজ হাতে নিয়ে মোটর বোটে উঠলাম। প্রথমতঃ 'কানোজি আংরে'কে খবর

দিতে হবে—তোমাদের বিশ্রামের সময় পার হয়েছে। যদি ওরা এখনও নৌকো বাইতে চায় তাই এক ফ্লাস্ক কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে গেলাম। যন্ত্র চালিত নৌকো। তবুও প্রবল জোয়ার আমাদের পিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ৪০ মিনিট কেটে গেল 'কানোজি আংরে'কে ধরতে।

—আমরা মোটর বোট নিয়ে আসতে পারছি না। আপনারা কীভাবে এগুচ্ছেন ?

ডিউকের উত্তর সেই এক, ডিউ টু কম্যাণ্ডার দাশ।

কফি আর বিস্কুট পেয়ে পিনাকী বলল, আপনারাও চান আমরা আরও কিছুক্ষণ চলি ?

ওখান থেকে চললাম দ্বিতীয় কাজটি করতে। অদূরে জেলেরা মাছ ধরছিল। আধঘণ্টা ওদের নৌকোয় অপেক্ষা করলাম। কিন্তু অভিযাত্রী এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় মাছ পেলাম না।

পদ্মনাভন : দেন ফিস্‌লেস্ ডে !

আমি খুশিই হয়েছিলাম। আজ শুট্‌কী মাছ খাওয়া যাবে ! 'গণেশের' সারেং বড়ুয়া এখবরটি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, মাছ না পেলে স্টকে যা আছে, (শুট্‌কী) তাই দিয়ে দুপুরটা চালানো যাবে !

তবে অন্য কাউকে লোইট্টা শুটকীর খবর দিই নি। আগাম খবরে ওদের অন্নপ্রাশনের ভাত বমি হয়ে যেতে পারে ভেবে।

লঞ্চে ফিরে দেখি ডিউক-পিন্টু-কমঃ দাশ বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে 'নদীয়ার' চীফ অফিসার সঞ্জীব সেন এলেন—কলকাতা থেকে পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান বি বি ঘোষের বার্তা নিয়ে।

বিশ্রামের পর অভিযাত্রীরা আবার ম্যাপ নিয়ে কমঃ দাশের সঙ্গে বসল পরামর্শের জন্য। তারপর আমি বসলাম ডিউকের সঙ্গে। সে ৬০ দিনের ছুটি নিয়ে অভিযানে এসেছে। ছুটি শুরু হয়েছে ১লা ফেব্রুয়ারি। হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, ডেথ অন ডিউটি হলে গভর্ণমেণ্ট পেনসন

দেয়। কিন্তু ছুটিতে, অভিযানে এসে মরলে পেনসন পাওয়া যাবে না। অল্প কিছু কমপেনসেশন দিতে পারে—বলেই আমার নোটবই আর কলম চেয়ে নিয়ে লিখে দিল :

মিস কোমল সচদেব
৫, শান্তি—৩,
১৯ পেড্‌ডার রোড, বোম্বাই-২৬।

'যাই হোক, যাই ঘটুক সব ওকে জানিও। মাঝ সমুদ্র থেকে তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে না ওর। ওয়ারলেসে কোনও খবর তোমরা পেলে ওকে জানিয়ে দিও।'

ডিউকের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টালাম।

'আচ্ছা তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, কোন্ জায়গা সবচেয়ে ভাল লেগেছে ?'

—আন্দামানের মত এত সুন্দর দ্বীপ পৃথিবীর কোথাও নেই। আন্দামানের কথা শুনেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই অভিযানে যেতেই হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আন্দামানের উপর আমি একটি বইয়ের অর্ধেক লিখে ফেলেছি।

ডিউকের বড় সাধ, বিয়ের পর আন্দামানেই বসবাস করে। অবশ্য ভাল চাকুরিও চাই সেখানে।

নৌকো ছাড়ার আগে ডিউক জানিয়ে গেল—মোহনা থেকে ওরা সঙ্গে আরও একটি কম্পাস ও রেডিও নেবে। ওয়ারলেস থাকছে দুটি। একটি ৮০ বর্গমাইলের মধ্যে বার্তা পাঠাতে পারবে, আর একটি ১০০ মাইল। তবে আকাশবাণী বা বাইরের কোন রেডিও স্টেশনের খবর ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাবে না। ওদের ওয়ারলেসে শুধু প্রেরক যন্ত্র আছে, গ্রাহক যন্ত্র নেই। গভীর সমুদ্রে পড়ে খাওয়া দাওয়া করবে দিনে দুবার। ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ। টিনের খাবার একবার গরম করে

নেবে—এটাই হবে রান্না বান্না। গভীর সমুদ্রে 'কানোজি আংরে'র গতি হবে ৩০ থেকে ৩৫ মাইল। পিনাকীরও আশা ওই রকম।

কম্যাণ্ডার দাশ আজ দুপুরে ওদের লঞ্চে খেতে দিলেন না। মোহনার পর তো আর লঞ্চ যাবে না। নৌকোয় সব কিছু সারতে হবে। আজ থেকে তাই তালিম দিচ্ছেন। সওয়া বারোটায় ওরা 'কানোজি আংরে'-তে নেমে গেল।

আগেই বলেছি—'ন্যান্সি' চলে গিয়েছে। রয়েছে 'দশরথ' ও 'গণেশ'। আজ ওরাও চলে যাবে। কলকাতা থেকে মিহির সেনের উত্তর পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব? আমাদের কী মোহনা পর্যন্ত যেতে দেওয়া হবে না? সঙ্গী সাংবাদিকদের কেউ কেউ কলকাতায় ফিরে যেতে চাইলেন 'দশরথের' সঙ্গে। আমার সঙ্গে ওদের মতদ্বৈধতা হল। বললাম, আমি মোহনা পর্যন্ত যাবই, তা যে কোন উপায়ে হোক। এপারের শেষ বিদায়ের খবর অবধি আমাকে ওদের সঙ্গে বা কাছাকাছি থাকতেই হবে।

সতীর্থরা আবার বাধা দিলেন, 'দশরথ', 'গণেশ' বা 'ন্যান্সিতে' তবুও ভাল ছিলাম। এর পর থাকা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

আবার পুরনো কথা তুললাম, ডিউক-পিন্টু এতদিন সমুদ্রে কাটাবে চরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে, আর দুএকদিনের কষ্ট আমরা সইতে পারবো না? তোমরা চলে যেতে পার, আমি মোহনায় যাবই। মোহনা পর্যন্ত যে-কোন জাহাজের ডেকে আমার স্থান হবে—এমন বিশ্বাস আমার আছে। হোক না ভারতীয় বা অভারতীয় জাহাজ! যদি বলি, আমি সাংবাদিক, আমি কলকাতা থেকে আন্দামান, প্রথম নৌ-অভিযানের রিপোর্ট লিখতে এসেছি—কে না আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবেন!

আমার ধারণা যে অমূলক ছিল না। পরে তা প্রমাণিতও হয়।

বেলা প্রায় একটা। আমরা কেউ স্নান সেরেছি। কারুর বা বাকি।

কলকাতা থেকে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি। শুনলাম, 'নদীয়ায়' বার্তা এসেছে—এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের এক্ষুনিই 'নদীয়ায়' চলে যেতে হবে। পনের মিনিট সময় হাতে। আবার হুলুস্থুল কাণ্ড। ঠিক গত রাত্রের মত। তখনও কারুর খাওয়া হয়নি। রান্নাও অসম্পূর্ণ। মানুষ যে অবস্থার দাস, সেদিন বুঝেছিলাম এই গ্যাসপার চ্যানেলে পড়েও।

'গণেশে' সাধারণত আমাদের রান্না হত। এদিনও হল। পাঁচ মিনিটে আমরা যেভাবে খাওয়া শেষ করেছিলাম তা অবর্ণনীয়। ঘোষণা করলাম—'নদীয়ায়' আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কলকাতায় পৌঁছান পর্যন্ত এটাই শেষ লাঞ্চ। দ্রুত সকলে হাতে প্লেট তুলে নিলেন। এদিন আর ডাইনিং টেবিলে বসে ধীরে ধীরে, স্বাদ বুঝে খাওয়া নয়। রেডিওর ভল্যুম কম বেশি নিয়ে তর্কাতর্কি বা কিসে ঝাল বেশি, নুন কম তাও নয়। ফেনা ভাত, উচ্ছে ভাজা আর শুটকী মাছের ঝাল। সকলে দেখি গরগর করছে রাগে। আমি মজা দেখছিলাম। বিজন আর পদ্মনাভন একবার ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছিল খেতে খেতে। ওদের দুই পা দুই লঞ্চে। কাছি দিয়ে লঞ্চ দুটি পাশাপাশি বাঁধা থাকলেও—আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। সাবধান না হলে বোধ হয় ওই অবস্থায় গ্যাসপার চ্যানেলের জলেই······।

সকলেই 'হৈঁই হৈঁই' করে উঠলেন। আমার কোনরকম ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অনেকদিন পর লোইট্টা শুটকী, আর কাঁচা লঙ্কা সহযোগে উচ্ছে ভাজা চমৎকার লাগছিল ক্ষিধের মুখে। গত কয়েকদিন সায়েবি ও বাঙালীয়ানার নানা খাদ্য জুটলেও এমনটি আর হয়নি। এমন তৃপ্তি পাইনি।

আমার সতীর্থরা কেউ বুঝতে পারেনি, কি মাছ খাচ্ছে। ওদের বলা হল সামুদ্রিক মাছ। ডেকের উপরে সবচেয়ে সাবধানে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিলাম,

কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলো আমার। 'দশরথ' থেকে 'গণেশে' প্লেটটা দিতে গিয়ে ঝুপ করে তা জলে পড়ে গেল। কাঁচের গ্লাসে জল খাচ্ছিলাম, ডেকে পড়ে গিয়ে সেটিও চূর্ণ-বিচূর্ণ। 'কাঁচ ভাঙা সুলক্ষণ' বলে তল্পিতল্পা নিয়ে মোটর বোটে উঠলাম। বিদায় 'দশরথ', বিদায় 'গণেশ'। কলকাতায় ফিরে দেখা হবে। পুলিশ ওয়ারলেসের ও দুই লঞ্চের কর্মীরা বিদায় জানালেন। দুই কিস্তিতে আমরা 'নদীয়ায়' এলাম। লঞ্চ দুটো কলকাতার দিকে চলে গেল।

'কানোজি আংরে' তখন দৃষ্টির বাইরে। এই ক'দিন আমরা সর্বদাই ওদের পিছু পিছু চলছিলাম। কিন্তু আজ দুপুরের পর উদ্বাস্তু হওয়ায় 'আংরে'কে অনুসরণ করতে পারিনি।

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে 'নদীয়ায়' উঠে কেবিন দখল শুরু করলাম। বিজন, শঙ্কর, পদ্মনাভন, মানিক, মানস, অমর চ্যাটার্জি ও আমি—আটজনের জন্য দুটো কেবিন। সাকুল্যে চারটি বেড। কে কোথায় থাকবে! এদিকে ডিউক, পিনাকী ও কমঃ দাশ বিশ্রামের জন্য আসবেন। ওঁদের জন্য সকলের আগে কেবিন চাই। সুতরাং শুধু তল্পিতল্পাগুলো ভিতরে রেখে বাইরে চলে এলাম।

'নদীয়া' সমুদ্রে চলাচলের উপযোগী জাহাজ হলেও কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত কোন জাহাজের যদি যান্ত্রিক গোলযোগ হয় তবেই এঁরা তাদের সাহায্য করেন। স্পেয়ার পার্টস সহ অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াররা এখানে আছেন। খবর পেলেই ওঁরা ছুটে যান। 'নদীয়ার' তরুণ চীফ ইঞ্জিনীয়ার এ, বি, ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হতেই পৃথিবীর বড় বড় জাহাজ দুর্ঘটনার খবর দিলেন। টাইটানিকের খবর তো সকলের জানা। ডেকে ক্যাম্বিস খাটে শুয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম; ১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় 'সাঙ্গোলা' জাহাজ কেটে দুভাগ করে ফেলা হয়েছিল বলেই অনেককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙলো

তিনটের পর। 'কানোজি আংরে'কে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এখন ওরা লোয়ার গ্যাসপার চ্যানেলে। একসঙ্গে দাঁড় ফেলছে অভিযাত্রীদ্বয়। কম্যাণ্ডার দাশ ঝুঁকে ঝুঁকে তাল দিচ্ছেন। আধ ঘণ্টা পরে ওরা দাঁড় থামাল। চুপচাপ বসে। বায়নাকুলারে দেখলাম বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই প্রথম উড়ুক্কু মাছ দেখলাম অভিযানে এসে। কয়েকশ' নয়, সম্ভবত কয়েক হাজার মাছ এক সঙ্গে লাফিয়ে কুড়ি বাইশ গজ দূরে পড়ল। পড়ন্ত সূর্যের ক্ষীণ আলো লম্ফমান মাছের গায়ে পড়ে চিক চিক করছিল। রূপোলি মাছগুলো মুহূর্তের জন্য রক্তিম হল।

এখন পৌনে পাঁচটা। দূরে আর একটি ড্রেজার—'মোহনা'। লোয়ার গ্যাসপার চ্যানেলে মোহনা মাটি কাটছিল। এই বিস্তীর্ণ জলরাশিরও কোন কোন স্থানে চড়া পড়ে গিয়েছে। বড় জাহাজগুলো ভাঁটার সময় আটকে যেতে পারে। 'মোহনা' মাটি কেটে কেটে জলের সঙ্গে সেই মাটি গুলে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। সারা বছর এই এলাকায় তাদের একমাত্র কাজ মাটি কাটা।

কলকাতার কথা মনে পড়ছিল—সারা বছর রাস্তা মেরামত না করলে কীভাবে পথ চলা দায় হয়, নর্দমা সংস্কার করা হলেও একটু বৃষ্টিতে রাস্তা ডুবে যায়। এখন দেখছি চলা দায় সাগরেও, (গঙ্গায় তো যে কোন সময় জাহাজের বিপদ হতে পারে চড়ায় আটকে !) এখানেও নিয়মিত মেরামতী (!) চাই।

সামনে সাগর

এবার বিদায় লোয়ার গ্যাসপার চ্যানেলকে। আরও গভীর এলাকায় পড়েছি। বিদায় স্থলকে। এবার সামনে সাগর, পিছনে সাগর,

সাগর ডাইনে-বাঁয়েও। এবার জল, শুধু জল। তবে অভিযাত্রীদের চিত্ত একটুও চঞ্চল নয়।

আমরা তো ফিরে যাবো। দিব্যি আরামে জাহাজে রয়েছি। কম্যাণ্ডার দাশও ফিরে আসবেন মোহনা থেকে। কিন্তু ডিউক আর পিনু? এই কী ওদের শেষ স্থল দেখা? ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল।

কলকাতায় ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল সাংবাদিক ও অভিযাত্রীর। কিন্তু এই ক'দিনে একাত্ম হয়ে গিয়েছি। ওরা আমাদের আপনজন হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে আমরা ওদের আপনজন হয়েছিলাম। সব কথা খুলে বলতো, মনে কোনরকম দ্বিধা ছিল না ডিউক-পিনাকীর।

পাঁচটা। এখন ওরা আমাদের কাছাকাছি। কমঃ দাশ ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিলেন। পিনাকী একটি ব্যাগ থেকে কি যেন বের করল। ডিউক ও কমঃ দাশ জ্যাকেট ঠিক করছেন। পিনাকীর খালি গা। জ্যাকেট বদলে সে সোয়েটার পরছে। নৌকো আমাদের জাহাজের কাছাকাছি। ওরা সম্ভবত জাহাজে উঠবে বিশ্রামের জন্য।

এখন সওয়া পাঁচটা। 'নদীয়া'র গায়ে 'কানোজি আংরে'কে বেঁধে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আমাদের বেশ কসরৎ করতে হলেও, ওরা, অনায়াসে উঠে এল। জাহাজে উঠতেই নিম্নতম কর্মী থেকে জাহাজের সবচেয়ে বড় অফিসার সকলেই ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কম্যাণ্ডার দাশের কী রকম প্রতিপত্তি জলের মানুষদের কাছে আজ কিছুটা উপলব্ধি করলাম। 'স্যার' বলে অধিকাংশই তাঁকে স্যালুট দিচ্ছিলেন।

এখন আমরা কলকাতা থেকে ৯৬ নটিক্যাল মাইল দূরে। আজ দুপুরের পর এসেছি ১৭ নটিক্যাল মাইল।

জাহাজের অফিসারদের প্রশ্নের জবাবে পিনাকী বলল, আই অ্যাম হ্যাপি,

ভেরি হ্যাপি। এবার আমাদের আসল অভিযান। নদী ছেড়ে আমরা এখন সাগরে। যে সাগরের কথা আমি এতদিন বইয়ে পড়েছি। পুরী, দীঘায় বেড়াতে গিয়ে তীরে বসে যে সাগর এতকাল আমাকে হাতছানি দিয়েছে। আমি গর্বিত, এতদিন পর তার ডাকে সাড়া দিতে পেরেছি। স্কুলে ছাত্রজীবনে বাবার দেওয়া থর হেইয়ের ডালের 'কন-টিকি' পড়েছিলাম। রোমাঞ্চিত হতাম, ভাবতাম আমিও যদি ওই রকম অভিযানে যাই কেমন হবে! মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতাম বালসা কাঠের ভেলায় চড়ে আমিও যেন কোন এক সাগর অভিযানে বেরিয়ে পড়েছি হেইয়ের ডালের মতই।

ছন্দপতন ঘটালেন কম্যাণ্ডার দাশ। 'আপনারা নাকি দুপুরে শুট্‌কী মাছ খাইছেন? বড় ভাল জিনিষ, আমারে কইলেন না ক্যান্।' শুট্‌কী বিরোধী সতীর্থদের সামনে কী বলি—মাথায় আসছিল না। পাছে যদি বমি শুরু হয়ে যায় ওদের! তবে এতক্ষণে দুপুরের খাদ্যগুলো হজম হয়ে গিয়েছে ভেবে নী ফিস্‌কে মুহূর্তের মধ্যে লোইট্টা বলে ঘোষণা করায় ওরা আর রা কাড়ল না। বরং কেউ কেউ বলল, জিনিষটা মন্দ নয়। 'কিন্তু ওই ছাইপাস খেয়ে শরীরের কোন উপকার হয়?'

আবার পিনাকীকে নিয়ে পড়লাম। কথার মাঝে আমার নোট বই আর কলম নিয়ে সে লিখল:

নদী শেষ হয়ে গেছে। আকাশের গায়ে মিশে গেছে শেষ তটরেখা। শুধু জল আর জল; কেমন যেন মনে হচ্ছে। পেরিয়ে এসেছি, হয়ত এমনি ভাবেই পেরিয়ে যাব—দূরের সকলকে মনে পড়ছে। বন্দেমাতরম। তুমি মা সুজলা সুফলা, হয়ত ছিলে শস্য শ্যামলা। কিন্তু কাল ভুল করেছে। এ মাটির মানুষ যারা, তারা কী শুধু শ্যামল? হয়ত বা রুক্ষও, অন্তত: যাদের কাঁদিয়ে এলাম, তাদের কাছে!

১৭-৩ মিনিট —পিনাকী

গ্যাসপার চ্যানেল। ৪।২।৬৯

সে আবার কিছু লিখতে যাচ্ছিল। ডিউকই থামিয়ে দিল। 'নো মোর' বলে কলম কেড়ে নিল। ডিউকের লেখা শুরুর আগে পিনাকী জানাল, চিরঞ্জীবদা, জাহাজের চেয়ে নৌকোই ভাল। আর উপরে এসে এই কেবিন, এই আরাম ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না আপনাদের খাবারগুলোও।

ডিউক ধমক দিল, চ্যাটার্জি ইজ এ সেন্টিমেণ্টাল বয়। ডোণ্ট বিলিভ···।

তার কাছে শুনলাম পিনাকীর বাবা আজ বোম্বাই যাচ্ছেন। ওর প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

সে লিখল :

To the readers of Ananda Bazar Patrika, Hindusthan Standard and all our well-wishers,

I wish to thank you for your emotional sent off and with the same feeling in our hearts we shall row to the Andamans.

Thank you all once again.

Lt. George Duke

February 4, 1969.

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জর্জ বলল : Current was ride down the channel, slightly towards west and rowing slightly east. Rowing has improved. Co-ordination developed for a long period of rowing. Boat is not leaking and working perfectly.

বড় জাহাজে এলাম বটে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল খবর পাঠানোর। যে কোন সময় 'নদীয়ার' ওয়ারলেস ব্যবহার করা চলে। পুলিশের

ওয়ারলেসের মত গোলমালে পড়তে হবে না। রেডিও অফিসারের হাতে ডেসপ্যাচটা দিলেই নিশ্চিন্ত।

খবর পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে বোধ হয় শঙ্কর ও মানস চীফ অফিসার সঞ্জীব সেনের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর ঘরে গিয়েছিল।

মানস ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, গুরু সব বোগাস্। ট্যুরটাই মাটি। এখান থেকে কোন খবর কলকাতায় পাঠানো যাবে না। এদের সঙ্গে যোগাযোগ কেবলমাত্র পোর্ট ওয়ারলেসের। তারা কোন খবরের কাগজকে নিউজ ট্রান্সমিট করে না।

খবর পাঠানো সম্ভব না হলে থেকে লাভ কী? 'দশরথেই' কলকাতা চলে গেলে হত। সতীর্থ সব সাংবাদিকের গালে হাত। কম্যাণ্ডার দাশের স্মরণাপন্ন হলাম। একমাত্র তিনিই সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন। যে কোন উপায়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

সারাদিন নৌকোয় থাকার পর জাহাজে উঠেও তিনি ক্লান্ত নন। ঝটপট চলে গেলেন ক্যাপ্টেনের কাছে, সেখান থেকে রেডিও অফিসারের ঘরে। চারিদিকে বার্তা পাঠালেন। যেভাবেই হোক স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার যুগান্তর ও ইউ এন আইয়ের জন্য দশ মিনিট করে মোট চল্লিশ মিনিট ওয়ারলেস ব্যবহার করতে দিতেই হবে।

সুখবর নিয়েই কম্যাণ্ডার দাশ 'নদীয়াব' ডাইনিং টেবিলে এলেন। 'জেণ্টলমেন অফ দ্য প্রেস.........। তাঁর কথার শুরুতেই বিজন বাধা দিল, দেশী কথায় কন্, কী করুম্ অখনে!

—আপনাগো আইধ ঘণ্টার মইধ্যে জাহাজ বদল কইরতে হইবো।

রথীনবাবুর এক কথাতেই পাইলট জাহাজ 'সাগর'এর ক্যাপ্টেন মোহন রাজি হন। তিনি জানান, মোহনা থেকে 'কানোজি আংরে'কে শেষ অভিনন্দন পর্যন্ত সাংবাদিকরা তাঁর জাহাজে থাকতে পারবেন। সাংবাদিকরা মাথা-পিছু অন্ততঃ ১০০টি শব্দ তাঁদের ওয়ারলেস মারফৎ

কলকাতায় পাঠাতে পারবেন। সেই খবর স্ব-স্ব অফিসেও পৌঁছে দেওয়া হবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের বুকে এমন ঘন ঘন জাহাজ বদল, এর আগে কখনও করিনি। কলকাতায় ফেরার পর একজন সামরিক সংবাদদাতা বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তিনি একদিন বার দশেক জাহাজ পাল্টেছিলেন।

জাহাজ বদলের কথা শুনে বিরক্ত হলেও দেখলাম আখেরে লাভই হচ্ছে। ক্রমশ প্রমোশান পাচ্ছি। 'দশরথ' ছিল লঞ্চ, তারপর 'নদীয়া' জাহাজ। এবার আরও বড় জাহাজ 'সাগর'। 'সাগরে'র মত পরিচ্ছন্ন জাহাজ কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত আর মাত্র একটি আছে। সেই 'সমুদ্র' ও এই 'সাগর'কে একই সঙ্গে ইংল্যাণ্ড থেকে আনা হয়েছিল কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের পাইলটদের ব্যবহারের জন্য। 'সমুদ্র' ও 'সাগর'কে মাসে এক পক্ষ মোহনায় থাকতে হয় পালাক্রমে। যে সব বিদেশী জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে মোহনা থেকে, কলকাতার পথ চেনার জন্য অভিজ্ঞ পাইলট অবশ্যই চাই। মোহনায় এসে বিদেশী বা ভিন্ বন্দর থেকে আগত জাহাজ বেতারে খবর পাঠায়, অপেক্ষমান পাইলট জাহাজে। 'সাগর' বা 'সমুদ্র' থেকে তারপর স্পীড বোট বা মোটর বোটে চড়ে পাইলট চলে যান সেই জাহাজে। কলকাতা বন্দর ত্যাগ করে যাওয়ার সময়ও এই পাইলটরাই জাহাজগুলিকে পথ দেখিয়ে মোহনা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। বলা বাহুল্য কলকাতা পোর্ট-কমিশনার্সের কর্তৃত্বও ওই মোহনা পর্যন্ত।

'নদীয়া' থেকে 'সাগরে'

'নদীয়ার' ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলাম অদূরে আলোকমালায় সজ্জিত একটি জাহাজ। কম্যাণ্ডার দাশ বললেন, পাইলট ভেসেল এসে গিয়েছে। আপনারা প্রস্তুত হোন। চিন্তা করবেন না। পুরো এয়ার কণ্ডিশানড্ জাহাজ। খাওয়া-দাওয়ার কোন সমস্যা নেই। কলকাতায়ও যা দুর্লভ এখানে তা সুলভ। ক্যান্টিনে বসে বেয়ারাকে অর্ডার দিলেই হল। কালেভদ্রে অসুবিধে হলেও আমার নাম করবেন। কেউ টু-শব্দ করবে না:

মানুষ সমান বড় বড় অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা 'পাইলট ভেসেল সাগর'। একটি স্পীড বোট এল ওদের তরফ থেকে। আমরা সকলেই উঠলাম এক নৌকোয়। ডিউক-পিনাকী রইল 'নদীয়ায়'। কম্যাণ্ডার দাশ এসে ক্যাপ্টেন মোহন ও অন্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কেবিনের ব্যবস্থা হল। প্রথম শ্রেণীর পাইলটদের কক্ষে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। খাসা ব্যবস্থা। কলকাতা দিল্লী বা বোম্বাইয়ের কোন বড় হোটেলে উঠেছি মনে হল।

কিন্তু তার আগে অনভিজ্ঞতার জন্য ছোট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও বেঁচে গেলাম। জল থেকে 'সাগরের' উচ্চতা 'নদীয়ার' চাইতে অনেক বেশি। অনভিজ্ঞদের কাছে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওঠাও ঝুঁকির ব্যাপার। বিজন তর তর করে উঠে গেল দেখে আমিও সাহস নিয়ে ওঠা শুরু করলাম। কিন্তু মাঝপথে হাত পিছলে গেল। দ্রুত সামলে নিয়েছিলাম। তা নাহলে ধড়াস করে নৌকোয় পড়তে হত। আর কে কে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে এল জানি না। তবে পরে দেখি ক্রেন নৌকোটাকে মানুষ ও আমাদের মালপত্তর শুদ্ধ ডেকের উপর নিয়ে এল।

কম্যাণ্ডার দাশের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মোহনের কক্ষের দিকে যাচ্ছিলাম। নিচের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ক্রেনের কাছিতে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। পায়ে ভীষণ লাগল। কিন্তু তখন কিছু বললাম না। পরে কেবিনে গিয়ে দেখি ট্রাউজার ছিঁড়ে পা কেটে গিয়েছে। অবশ্য রক্তপড়া তখন বন্ধ হয়েছে।

তখন হুমড়ি খেয়ে কপালগুণে ডানদিকে পড়েছিলাম। বাঁদিকে পড়লে ডেক থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে সমুদ্রে সলিল সমাধিই একমাত্র প্রাপ্য ছিল।

'সাগর'-এ এসে নিশ্চিন্ত হলাম। বিজন ও আমি পৃথক পৃথক কেবিন না নিয়ে একটা বড় কেবিনে ঢুকলাম। পদ্মনাভন, মানস, শঙ্কর ও মানিক আলাদা আলাদা রইল ভিতরের দিকে।

আমরা দুজন জাহাজের বাঁদিকে। পট হোল খুললেই আকাশ দেখা যাবে। এয়ারকণ্ডিশানড্-এর বদলে প্রয়োজনে সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়াও পাবো।

কম্যাণ্ডার দাশ 'নদীয়ায়' ফিরে গেলেন। রাত্রে ভাঁটার সময় আবার নৌকো ছাড়বেন। মোহনার আগে আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। এর মধ্যে আর ওরা জাহাজে উঠবে না। মোহনায় গিয়ে একবার হয়ত জাহাজে আসতে পাবে বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে। তাও চেয়ারম্যান মিহির সেনের অনুমতি সাপেক্ষ। এতক্ষণ এসব জানতাম না। কমঃ দাশই যাওয়ার সময় বলে গেলেন ওই কথা। এবার বুঝলাম, ডিউক ও পিনাকী কেন নোট বই নিয়ে ওইসব কথা লিখেছিল।

আমাদের জাহাজ মোহনার দিকে এগুতে লাগল। মাত্র ১০০ শব্দের বেশি পাঠানো যাবে না। সুতরাং ভাবনা অনেক। অল্প কথায় সারা দিনের খবর জানাতে হবে। বিজন বলল, ভাবনের কিছু নাই। গুরুর নাম লইয়া বইসা পড়, উৎরাইয়া যাইবা।

এদিকে মানস এসে বিরক্ত করছে, গুরু কি লিখলে। শঙ্করের চিরাচরিত

ঠাট্টা—হ্যালো মিস্টার মানস, 'প্রমিজিং' রিপোর্টার অব দ্য স্টেটসম্যান, হাউ ডু ইউ ডু।

শঙ্করের ডেসপ্যাচ রেডি। আমার সবে শুরু, মানিক দরজা বন্ধ করে কি করছে ওই জানে। আগে বলেছি আন্দামান অভিযানে সবচেয়ে নিশ্চিত ছিল পদ্মনাভন। 'সাগরে' সে পানীয় ও সিগারেট সম্বল করেই (মহা) আনন্দে কাটিয়াছে। আমরা যখন ডেসপ্যাচ নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছি, সে তখন 'বার' এ বসে হয়তো বেয়ারাকে অর্ডার দিয়েছে—আউর একঠো বড়া স্কচ।

ক্যাপ্টেন একজন অফিসারকে পাঠালেন আমাদের কাছে,—রাত ন'টার মধ্যে যেন আমরা ডেসপ্যাচ গুলো তাঁর কাছে পৌছে দিই।

সকলের শেষে নটা বাজার এক মিনিট আগে হন্তদন্ত করে ক্যাপ্টেনের ঘরে পৌছে শুনি সকলেই রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছে। আমি 'লাস্টম্যান'। 'ডোণ্ট মাইণ্ড' -বললেন ক্যাপ্টেন। বর্ণানুক্রমিক পাঠানো হবে, জানালেন রেডিও অফিসার। 'আনন্দবাজার, দ্যাট ইজ—এ', বললেন ক্যাপ্টেন। তোমারটাই সকলের আগে যাবে। তবে কাউকে একথা বলবে না।

খবর সম্পর্কে সব ঝামেলা চুকিয়ে কেবিনে চলে এলাম। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। গত কদিন লঞ্চে থাকলেও 'কানোজি আংরে'র পিছু পিছুই ছিলাম। ওদের খবর পেতে কোনই অসুবিধা ছিল না। এখন জাহাজে আরামে বাস, খাওয়ার রাজসূয় আয়োজন থাকলেও ডিউক-পিনাকী বিহনে অস্থির আমরা সকলেই। 'সাগর' দ্রুত গতিতে সাগর পানে মোহনার দিকে ছুটে চলেছে। এখন গতি ঘণ্টায় ৪০ নটিক্যাল মাইল। জাহাজের দুই পার্শ্বে সাদা ফেনা। কাছে দূরে মাঝে মাঝে দুএকটি জাহাজের দেখা পাচ্ছি। ব্রীজে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলাম। চীফ অফিসার এন, সি, সরকার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ব্রীজ থেকে তাঁর নির্দেশ চলে যাচ্ছে ইঞ্জিন ঘরে। স্লো, ফাস্ট না মিডিয়াম ফাস্ট।

লেফট না রাইট ইত্যাদি নির্দেশ। মাঝে মাঝে সার্চলাইট ফেলা হচ্ছে। শ্রীসরকার দূরবীণে ওই অন্ধকারে কি দেখছেন জানিনা—পাঁচতলা বাড়ির চাইতেও উঁচু ওই ব্রীজ থেকে।

ব্রিজের লাগোয়া একটি ঘরে উঁকি মেরে দেখি, দুইজন বসে। কানে হেড ফোন। সামনে বড় বড় মেশিন। পিঁ পিঁ পিপ্-পিপ্ পি ইত্যাদি শব্দ। ওঁরা দ্রুত কি সব লিখে চলেছেন। কোনটা পাঠাচ্ছেন ক্যাপ্টেন মোহনকে, কোনটা চীফ অফিসারকে। ওয়েটিং রুমে কয়েকজন পাইলট সেজে গুজে বসে। নির্দেশ এলেই মাঝ সমুদ্রের যে কোন জাহাজে চলে যাবেন তাদের দিকদর্শনে সাহায্যের জন্য।

আবার ব্রীজের ধারে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়ালাম। দেখছিলাম হতভম্ব হয়ে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। চীফ অফিসার ওয়েদার রিপোর্ট চাইলেন। 'না ভয়ের কারণ নেই। মেঘ থাকলেও ঝড়ের সম্ভাবনা কম।'

রেডিও অফিসার বললেন, হোক না ঝড়, ভয়ের কি! আমাদের তো বছরের পর বছর কাটছে এইভাবে। আর এখন মনসুনও নয়। ঝড় হলে সামান্য হবে। সমুদ্রের বড় ঢেউয়ে কেমন লাগে একটু দেখে যান সাংবাদিকরা। আপনারা তো সহরবাসী সাংবাদিক। আমাদের অবস্থা দেখুন। ডাঙার মানুষকে গিয়ে বলতে পারবেন প্রাণ হাতে নিয়ে ওরা কেমন করে জীবন অতিবাহিত করছে। তবুও ওরা ধর্মঘট করে না, কর্মবিরতি পালন করে না। লিখে দেবেন, তোমরা কত সামান্য কারণে আন্দোলন করে থাকো, কিন্তু ওরা তা পারে না। তা হলে বন্দর অচল হবে। খাদ্য আসবে না। আসবে না প্রয়োজনীয় শতেক জিনিষ।

চীফ অফিসার বাধা দিলেন, ত্রিশ-চল্লিশ ফুট ঢেউ না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না সমুদ্রের আসল রূপ কি, জাহাজে তখন কেমন লাগে, আর তার সঙ্গে আমরা কী ভাবে মোকাবিলা করে বেঁচে আছি।

তখন কেমন হয় জানেন? ঢেউগুলো এতবড় জাহাজকে স্বর্গে তুলে আবার যেন পাতালে ফেলে দেয়। এখন ঢেউ আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে, তখন বিপরীত অবস্থা ; জাহাজই আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের উপর, সমুদ্রের বুকে।

ইতিমধ্যে আর একটি ওয়েদার রিপোর্ট এসে গেল। চীফ অফিসার শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন, 'সাইক্লোন হতি পারে, কর্তা নিচি যাও'। আমি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে গেলাম। আবার অ্যাকসিডেন্ট। আমার চওড়া কপালে এমন লাগলো যে মুহূর্ত মধ্যে তা বড় টিউমারের আকার নিল। সতীর্থরা তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পদ্মনাভন ঝিমিয়ে পড়েছে। বিজনের নাকে ঘড়ঘড়ানি।

চীফ অফিসার পোশাক বদল করে চলে এলেন আমাদের কেবিনে। বিজনের কাঁচা ঘুম ভাঙানো হল। ইতিমধ্যে আর একটি বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেলেন জনৈক অফিসার। 'সাগর' কাল সকালে ১৫ মিনিটের জন্য ডায়মণ্ডহারবার যাবে। কিছু প্রয়োজন থাকলে সাংবাদিকরা এক্ষুনিই কলকাতায় ওয়ারলেস পাঠাতে পারেন। কাল সকালে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান শ্রীসেন ছাড়াও কয়েকজন সাংবাদিক ডায়মণ্ডহারবার থেকে 'সাগরে' উঠবেন।

চীফ অফিসার শ্রীসরকার চলে যাওয়ার পর একে একে আরও কয়েকজন এলেন আলাপ করতে। অবশেষে কয়েকজন ক্রু ও। তাঁদের আর্জি, ডিউক-পিনাকীকে তাঁরা রিসেপশান দিতে চান, সাংবাদিকদের জন্য টি পার্টি ইত্যাদি। আমি এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। 'সব ব্যবস্থা হবে।'

কিছুতেই ঘুমুতে পারছি না। পট হোল দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশ পরিষ্কার। তারকা খচিত। অজস্র তারা, লক্ষ লক্ষ। সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। তবে তখন রাত একটা। আকাশে চাঁদ নেই। আমি খালি গায়ে, হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলাম কেবিন

থেকে। মাঝ সাগরে 'সাগর' নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। অদূরে বহুদূরে কেবল জাহাজ আর জাহাজ। আলোকমালায় সাজানো বলেই জাহাজগুলো দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আলো মাস্তুলে, ক্রেণে, ব্রীজের উপরে। হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল: 'কানোজ্জি' কোথায়? 'কানোজ্জি আংরে'! জাহাজের তুই প্রান্তে গিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। 'নদীয়া'ও কাছে পিঠে কোথাও আছে বলে মনে হল না। থাকবেই বা কেমন করে? আমরা যে গত সন্ধ্যার পর তীর বেগে ছুটে এসেছি মোহনার দিকে, আর 'আংরে' চলছে ঢুলকি চালে। 'নদীয়া' আছে তার পিছু পিছু।

'আংরে'র চিন্তা ছেড়ে দিলাম। একবার ভাবলাম সারা জাহাজের মানুষগুলো ঘুমোচ্ছেন। আর আমি এই ভাবে ঘুরছি। যদি সমুদ্রে পড়ে যাই, কে রক্ষা করবে, কে বাঁচাবে। 'বাঁচাও' আমার এ করুণ আর্তনাদ তো কারুর কানে পৌঁছোবে না! সন্তর্পণে ডেকের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। জাহাজের পিছনের দিকে দেখি কে যেন বসে। বেশ বুঝতে পারছি কেউ একজন সিগারেট বা বিড়ি ধরিয়েছেন। 'কে ওখানে' শব্দ না করে এগিয়ে গেলাম। গা ছম ছম করছিল। ভূতের কথাও যে মনে হয়নি এমন কথা বললে মিছে বলা হবে। ছোটবেলায় শোনা ঠাকুরমা'র কথা মনে পড়ল, 'আগুন আর ভূত কাছাকাছি থাকে না।'

—চিরঞ্জীব বাবু না!

—হ্যাঁ।

—আসুন। মাছ ধরা দেখবেন আসুন।

একটু অবাক লাগলো। মামদো ভূত নয় তো!

—কীভাবে মাছ ধরছেন?

একজন নন, আরও তু'জন রয়েছেন। কাল ওঁদের ছুটি। অফ ডে। তাই আজ রাত জেগে মাছ ধরতে ব্যস্ত।

—আমরা তো সায়েব সুবো মানুষ নই! আপনাদের মত ভি, আই, পি ও না। আমরা সামান্য ক্রু। নিজেরাই রান্না করে খাই। দু চারটে মাছ পেলে চলে যায়।

চারতলা সমান উঁচু বাড়ির মত জাহাজের ডেক থেকে ছিপ ফেলা হয়েছে। সুতো দেখে মনে হবে বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। আর একজনের হাতে লম্বা কাঠের ডাণ্ডায় জাল লাগানো। ওই ছিপে মাছ ধরা হয়, ওই জালেও মাছ পড়ে। দেখেই যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারের কথা মনে পড়ল। সরকার মশাই মঞ্চে শূন্য থেকে যে ভাবে পাখি শিকার করেন, সেই রকম কোন ব্যাপার নয় তো! আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ওই ধারণা পাল্টাতে হল। ছিপে একাধিক মাছ উঠলো। একবার ওঁরা তিনজন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—লম্বা কাঠের ডাণ্ডাটি একটু নামিয়ে ধরলেন। 'আরেকটু ঘুরিয়ে ধর'। মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু মাছ পাওয়া গেল এক কিলোর উপর। সব তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছে। আগের দিন উড়ুক্কু মাছ দেখেছিলাম লাফিয়ে যেতে। আজ শুধু লাফানো নয়, ধরাও পড়লো জালে। জলে জাল না ফেলেও মাছ ধরা যায় এবং তা ম্যাজিক নয় এই প্রথম প্রমাণ পেলাম। এরপর জলে ছিপ না ফেললেও কবে মাছ ধরা যাবে কে জানে!

—উড়ুক্কু মাছের স্বাদ কেমন?

—মুখে বললে বুঝতে পারবেন না। ভেজে আপনার কেবিনে পাঠিয়ে দেব। আর একজন বললেন, আপনার ওখানে পাঠানো ঠিক হবে না, আপনারা ক্যাপ্টেনের গেস্ট, বড় সায়েবের অতিথি। জানতে পারলে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। আপনি বরং আমাদের ওখানে আসুন। চা'য়ের নেমন্তন্ন রইল। তখনই টেষ্ট করে দেখবেন।

আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। 'কাল সকালে আপনাদের ওখানে চা খাবো। অন্যদেরও নিয়ে যেতে পারি।'

—আপনাদের সম্পর্কে আমাদের প্রচণ্ড কৌতুহল, কত বিপদ বাধা তুচ্ছ করে খবর সংগ্রহ করেন, কত লোকের সংগে মিশছেন। আসুন আমাদের মধ্যে। সকলে খুশি হবেন।

—আপনাদের জীবনটাও তো নাটকীয়। বছরের পর বছর জলে রয়েছেন। 'সাগর'ই আপনাদের ঘর সংসার। জীবনের অধিকাংশ সময় তো জলের উপরে কেটে যাচ্ছে। এর আগে কোনদিন আপনাদের সঙ্গে মিশতে পারিনি। শুধু দু-একটা ইংরাজি-বাংলা বইয়ে পড়েছি আপনাদের জীবনযাপনের কথা।

আর দেরি সইল না। নেমে গেলাম নিচে ওদের মধ্যে। দোতলায় নামতেই শুনলাম, ওখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের থাকার জায়গা, ডাইনিং হল ইত্যাদি। এবার একতলায়। ক্রু-রা ওখানে থাকেন। একতলাটা পুরো ওদের জন্য সংরক্ষিত। খাওয়া থাকার জায়গা ছাড়াও বিশ্রাম কক্ষ, ক্লাব ঘর। ক্লাব ঘরে নানারকম ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা আছে। রেডিও রয়েছে। পাশেই লাইব্রেরী। আশ্চর্য লাগল। সমুদ্রের বুকে জাহাজের ছোট্ট ঘরে গ্রন্থাগার। আলমারী ভর্তি ইংরাজি বাংলা কয়েক হাজার বই। উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প—সব রকম বই। রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, বাইবেলও।

দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় ছবি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের। কলকাতায় লাইব্রেরিতে দেখেছি বই ইস্যুর খাতা —এখানেও সেরকম রয়েছে। দেরী হলে ফাইনও দিতে হয়।

রাতের গোপন অভিসার শেষ করে চলে এলাম উপরে। একটা প্রশ্ন জাগল—অন্ততঃ পনের দিন তো এক নাগাড়ে ওদের এই মোহনায় থাকতে হয়। আত্মীয় পরিজনের খবর পায় কি করে! নানা বিপদ আপদ তো আছে! পরে জানতে পারি কলকাতা থেকে মোহনাগামী জাহাজে ওদের চিঠিপত্র আসে। আবার কলকাতাগামী জাহাজে ডাক চলে যায়। দিনে দুবারও চিঠি পাঠানো বা পাওয়ার ব্যবস্থাও

আছে। কলকাতা থেকে মোহনার মাঝে কর্তব্যরত সব জাহাজীদের জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে। নাম ও 'কেয়ার অফ' কোন্ জাহাজ লিখলেই ওঁরা চিঠি পেয়ে যান।

ইতিমধ্যে দুঘণ্টা অতিক্রান্ত। তারা অনেক কমেছে। ঝির ঝিরে হাওয়া বইছে। ডায়নামো চলতে থাকলেও চলমান জাহাজের তুলনায় এখন অনেক নিস্তব্ধ। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে বড্ড রাগ হচ্ছিল কবি আর সাহিত্যিকদের উপর। তাঁরা এঁদের জীবন নিয়ে লেখেন না কেন? পাহাড় পর্বতের কথা অনেকে লিখেছেন, ভ্রমণ কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, কবিতা লেখা হয়েছে। কিন্তু সমুদ্র নিয়ে লেখা হয়েছে খুবই কম।

মৃদুমন্দ হাওয়া চমৎকার লাগছিল। হঠাৎ মনে হল, এই জাহাজ 'সাগর', সীমাহীন এই সমুদ্র এবং আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কলকাতা, সেখানকার কোলাহল, ট্রাম-বাস, রাজনৈতিক দলাদলি, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি সব মিছে। মিছে ক্ষুদ্র চাওয়া—পাওয়ার ওই জগৎ। আরও মিছে আমাদের কামনা বাসনা। সেই মুহূর্তে মনে হল পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই। মা, বাবা, বাড়িতে রেখে আসা আমার 'গার্জেন' সাত বছরের ভাগ্নী কোকো, রোজ সকালে ম্যাও ম্যাও করে রুটির জন্য যে বিড়ালটি এসে আমার পায়ে মাথা ঘসে, সে সব স্বপ্ন, কল্পনা। কোনদিন ওসব ছিল না। আনন্দবাজার পত্রিকা নামে কোন খবরের কাগজ নেই। এক বান্ধবীর কথা মনে পড়ল। বিয়ের কিছুদিন পরও তিনি মাঝে মাঝে দেখা করতেন আমার সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে। আর একজন? তাঁকে বলেছিলাম, 'তোমার বিয়ে তুমিই দেখতে পারবে না।'—এসব কথাও কোনদিন কাউকে বলেছি বলে মনে হল না। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে সব চিন্তা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্র তখন অশান্ত। ফুলে উঠেছে। বড় বড় ঢেউ। জাহাজও দুলছে। দিক ঠিক করতে পারছিলাম না। কিন্তু আকাশ দেখে দিক বুঝতে অসুবিধাও হল না।

বাঁ দিকের আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে। কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে ৪৫ মিনিটে যে-সব দৃশ্য (বিকাল থেকে সন্ধ্যা, রাত্রি এবং সূর্যোদয়) দেখানো হয়; আজ সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে তাই দেখছি।

কেবিনে ফিরে বিজনকে ডাকার চেষ্টা করলাম। 'উঁহু উঁহু' করে ও পাশ ফিরলো। আবার বেরিয়ে এলাম। হয়তো আর কোনদিন প্রকৃতিকে এমনভাবে আকণ্ঠভরে দেখার সুযোগ পাব না। পূবাকাশ আরও পরিষ্কার। দূরে যেদিকে তাকাই সমুদ্রে আকাশে একাকার। হঠাৎ দেখি ব্রহ্মাণ্ডময় কে যেন রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সামান্য কুয়াশা ছিল, তাও রক্তিম। সাবা আকাশ সারা সমুদ্র আবিরে রাঙানো। আমার দৃষ্টি সব দিকেই, কিন্তু পূবদিকে বেশি। কাল রাত্রে শুনেছিলাম নাবিকদের কাছে, সমুদ্রে দুটো জিনিষ দেখবেন— সূর্য ওঠা আর ডোবা। চোখ জুড়িয়ে যাবে, প্রাণও ভরবে।

আজ ৫ই ফেব্রুয়ারি। দূরে, বহুদূরে সমুদ্রের ভিতর থেকে গাঢ়লাল কী যেন বেরিয়ে আসছে। শান্ত সমুদ্রে মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি কিছু চাপা দিয়ে রেখেছে—ওই পূব দিকে জলের মধ্যে। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে আসতে লাগল। নির্মেঘ আকাশে তার রং ছড়িয়ে পড়েছে। একবার মনে হল সূর্যটা খুব দূরে নয়। বড় জোর মাইল পাঁচেক। জাহাজটা ওই দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলে হয়ত ধরে ফেলা যাবে। একেবারে ছেলেমানুষী চিন্তা! কৈশোরে একবার শিমুলতলায় গিয়ে পাহাড় দেখে, তাতে চড়তে গিয়ে বোকা হয়েছিলাম—এক ঘণ্টা হেঁটে তারপর ফিরে আসি নাগাল না পেয়ে।

আরও কয়েক ঘণ্টা গেলে পাহাড়ের নাগাল পেতাম। কিন্তু সূর্যের নাগাল যে কোনদিনই পাবো না, সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলাম ওই মুহূর্তে।

আমার চিন্তায় বৈকল্য এনে দিল জাহাজের ইঞ্জিন। 'সাগর' যাবে

ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। অনেকেই উঠে পড়েছে; মানস, পদ্মনাভন, বিজন, শংকর সকলে। দরজা বন্ধ ছিল মানিকের। ওদের কাছে গতরাত্রের গল্প বললাম। ইতিমধ্যে একতলা থেকে নাবিকরা এসেছেন। ওদের মহল্লায় ব্রেকফাস্ট করতে হবে, উড়ুক্কু মাছ সহযোগে। এদিকে ক্যাপ্টেনের লোক এসে খবর দিলেন, আপনাদের ব্রেকফাস্ট রেডি। সেই সকালে দুবার ব্রেকফাস্ট খেতে হয়েছিল আমাদের।

'সাগর' দ্রুত ছুটে চলেছে ডায়মণ্ডহারবার পানে। ক্যাপ্টেন আবার খবর পাঠালেন আমাদের কাছে—ডায়মণ্ডহারবারে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের লোক আসবেন, কলকাতায় তাদের কাছে ছবি বা খবর পাঠাতে পারবেন। ডায়মণ্ডহারবারে ১৫ মিনিটের জন্য নামতেও পারা যাবে—শুনেই সকলে কলম, প্যাড নিয়ে বসে গেল। আমিও। কিন্তু লিখব কি! অভিযানের খবর লিখতে এসেছি, অভিযাত্রীরা কোথায়? তারা কত দূরে, কেমন আছে—অন্তত এই দুটি প্রশ্নের জবার তো চাই। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত জানতাম, ওরা কোথায়। তারপর তো আর দেখা নেই 'কানোজি আংরে'র। সুতরাং···। ব্রীজে গিয়ে পাইলটদের দূরবীণ নিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। পাত্তা পেলাম না। সাহায্য করলেন —চীফ অফিসাব—সরকার। রেডিও অফিসারকে বললেন, 'নদীয়া' কোথায়? ওয়ারলেসে দেখুন না! 'কানোজি আংরে'র লোকেসান আর ওদের খবরটাও চাই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে উত্তরও পেলাম।

সরকার জিজ্ঞাসা করলেন—আর সকলে কই?

—রিপোর্ট লিখছে, সকলেই কেবিনে।

সরকারও পূর্ববঙ্গের লোক। বললেন, বিজনবাবুরে ডাকেন। সমুদ্রের মইধ্যে থিকা নৌকোর ছবি তোলেন। স্কুপ হইয়া যাইবো আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে। আমি জাহাজডারে 'কানোজি আংরে'র কাছ দিয়া লইয়া যামুনে।

দেখাও হল ওদের সঙ্গে। 'কানোজি আংরে' তখন ইণ্টারমিটিয়েট

চ্যানেলে। 'নদীয়া' ওদের পাহারা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। দুই পার্শ্বে শুশুকের দল, ওরা যেন আরও বড় পাহারাদার। মনে হল, দাঁড়ের নৌকোর সঙ্গে ওরাও আন্দামান যাচ্ছে।

এবার কেবিনে গিয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করলাম। বিজন ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে প্যাকেট করল। তারপর রাত্রের অনিদ্রাটাকে পুষিয়ে নিলাম। না ঘুমিয়ে উপায়ও ছিল না। কেন না, আজ মাঝ রাত্রে হয়ত ডিউক-পিনাকীকে বিদায় জানাতে হবে। সুতরাং আবার রাত্রি জাগরণের ব্যাপার রয়েছে।

ডায়মণ্ডহারবার পৌঁছলাম বেলা দুটো নাগাদ। যেন অনেকদিন পর স্থলে নামছি। মাঝ গঙ্গায় 'সাগর' নোঙর করল। মোটর বোটে চড়ে গেলাম জেটিতে। আমাদের নতুন কয়েকজন সঙ্গী এসেছেন।

—সেকি জিতেনদা? আপনি?

—আমি ঠিক হয়ে গেছি। আর সী সিকের সম্ভাবনা নেই। সঙ্গে কড়া কড়া ওষুধও এনেছি। গা বমি বমি করলেই টপাটপ গিলে ফেলবো। আমারও মনে হল তিনি পুরোপুরি ফিট।

আজ মিহির সেনও এসেছেন। তিনিও মোহনা থেকে ডিউক-পিনাকী ও 'কানোজি আংরে'কে এপারের শেষ অভিনন্দন জানাবেন।

নতুনদের মধ্যে আর দুইজন সাংবাদিক আছেন। একজন আকাশবাণীর পার্থ ঘোষ, আর একজন জুনিয়র স্টেটসম্যানের অভিজিত দাশগুপ্ত। পার্থ-র সঙ্গে টেপ রেকর্ডার, সংবাদ বিচিত্রা, নিউজ রীল ইত্যাদির জন্য; অভিজিত শুধু লিখবে না, ছবিও তুলবে।

মাটির আকর্ষণ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। ১৫ মিনিটের ছুটি পেলেও ৪৫ মিনিট কেটে গেল ডায়মণ্ডহারবারে। ক্যাপ্টেন মোহন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। জাহাজ হুইশল বাজাচ্ছে। স্পীড বোটের মারফৎ জেটিতে খবর পাঠালেন পাঁচমিনিটের মধ্যে জাহাজে না ফিরলে তাকে এখানেই থেকে যেতে হবে মোহনায় আর যাওয়া হবে না।

দেরী না করে স্পীড বোটে উঠলাম। আবার দড়ির সিঁড়ি বেয়ে পাইলট জাহাজ 'সাগরে'। 'সাগর' আবার দ্রুত সাগরপানে ছুটে চলল। এখন তিনটে পাঁচ। পার্থ ও অভিজিত আমাদের কাছাকাছি একটি কেবিনে আস্তানা নিল। জিতেনদা ও মিহিরদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল জাহাজের সামনের দিকে সিনিয়র পাইলটদের দুটো কেবিন।

মিহিরদা ধন্যবাদ জানালেন আমাদের প্রত্যেককে—'দুর্দান্ত কভারেজ হচ্ছে। ইলেকশনের চড়া বাজারেও প্রত্যেকটি কাগজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে আন্দামান অভিযানকে।' তাঁর কাছে কাগজের কাটিং দেখলাম। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে রোজই প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি ও খবর। যুগান্তর, স্টেটসম্যানও প্রায় সমান গুরুত্ব দিয়েছে।

একতলা থেকে আজ আবার কয়েকজন ক্রু এলেন চিফ অফিসার এন সি সরকারকে সঙ্গে নিয়ে, আর্জি সেই টি-পার্টির। মিহির সেনের কথা তাঁরা কাগজে পড়েছেন, লোক মুখে শুনেছেন। কিন্তু চোখে দেখছেন এই প্রথম।

ওদের কথা মিহিরদাকে বললাম। এক কথায় রাজি হলেন তিনি। তারপর একতলায় যেন ধুমধাম পড়ে গেল। হৈ চৈ নাবিকদের মধ্যে। পাঁচটা নাগাদ চা-এর আসর ওদের লাইব্রেরী ঘরে। বক্তৃতাও হল। প্রবীন এক নাবিক বললেন, আমরা জলের উপরে থাকি, মিহির সেনও সাতটি সমুদ্র পার হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আত্মিক। এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের এই অভিযানের খবর যেদিন আমরা কাগজে পড়ি সেদিন থেকেই উৎসুক হয়ে আছি, কবে তাঁদের দেখা পাবো। আজ এই সময় শ্রীসেনকে জানিয়ে রাখছি, তাঁর ক্লাবের পরবর্তী অভিযানে আমরা অংশ নেব। মিহিরদা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে উপরে চলে গেলেন। আমরা—সাংবাদিক ক'জন রয়ে গেলাম। জিতেনদা বললেন, এদের এখানে আরও কিছুক্ষণ কাটানো যাক, উপরে তো কোন কাজ নেই। আমরা তখন হলদিয়া ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছি। দূরে

সাগরদ্বীপকে আবছা দেখা যাচ্ছে। একতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখি সামনে খোলা। নোঙরের বড় বড় শিকল। জিতেনদা বললেন, চমৎকার জায়গা। এখানেই কাটানো যাক। আজ কিছু নাচ-গান হোক। আর এমন সুযোগ পাওয়া যাবে না। রাত্রে ডিউক-পিনাকীকে বিদায় দিতে হবে। তারপর ফিরে যেতে হবে কলকাতায়। কে গান গাইবে! আমি তো কোন গানের প্রথম কলি ছাড়া জানি না। মানস শুনে বলল, আমি দুকলির বেশি জানি না। জিতেনদা বললেন, এই সব ইয়ংম্যানদের দিয়ে কোন কাজ হবে না। বলতে বলতে তিনি নাচ শুরু করে দিলেন। শংকর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, জিতেনদা যাতে জলে পড়ে না যান। 'আমি ঠিক আছি, জলে পড়ব না।' বুড়ো মানুষটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতার সুযোগ না হলেও তাঁর মধ্যে অমন উচ্ছ্বাস কখনও দেখিনি। মানস, শংকর, বিজন, অভিজিত, মানিক, পার্থ আমার দিকে তাকিয়ে—আবার সী সিক·········। আমি মুচকি হাসলাম। 'চুপ'। জিতেনদা তখন শুরু করেছেন—'আমরা অদ্ভুত, আমরা চঞ্চল·········'। চমৎকার গাইলেন। 'নদী আপনবেগে' শেষ করেই জিজ্ঞাসা করলেন, লাগছে কেমন? আমরা হাততালি দিয়ে 'চমৎকার', 'এঙ্কোর', 'আর একখানা দাদা।' এবার ধরলেন, 'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' তারপরেই 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'! এক নাগাড়ে দশটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন।

'আপনি আজ এত স্ট্যামিনা কোথায় পেলেন?' শংকরের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন—এতগুলো ইয়ংম্যানের মধ্যে পড়ে আমিও ইয়ং হয়ে গেছি।

সেদিন কাউকে জিতেনদার স্ট্যামিনা ফিরে পাওয়ার কারণ বলিনি। জিতেনদা নিজেও জানতেন না। আমিই সেদিন ডাক্তারের ভূমিকা নিয়েছিলাম ওঁর অসুখের কথা ভেবে। ম্যান ও ওয়ার জেটি থেকে রওনার পর কথায় কথায় মনে হয়েছিল—সমুদ্রে বা নদীতে গেলেই

অসুখ হয়—এমন একটা ম্যানিয়া জিতেনদার আছে। সেদিন টি-পার্টিতে যাওয়ার আগে তাই কোককোলার সঙ্গে হুইস্কী মিশিয়ে দিয়েছিলাম। পরিমাণ অল্প থাকলেও অনভ্যাস বশতঃ তিনি ওতেই তারুণ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। জানতাম, আমি অন্যায় করছি, গুরুতর অন্যায় করছি এমন একজনকে মদ দিয়ে যিনি গান্ধীজির সঙ্গে কাটিয়েছেন সুদীর্ঘকাল।

আবার অসুস্থ হওয়ার ভয়ে তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে ট্যাবলেট খেয়েছেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই আমি রাম বা হুইস্কী মিশিয়ে দিয়েছি কোককোলার সঙ্গে।

'আংরে' মোহনায়

'আংরে'র খবর কী! রেডিও অফিসার 'নদীয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, বিকাল পাঁচটায় ডিউক-পিনাকী মোহনায় পৌঁছেছে। ওরা ভাল আছে। কাল রাত বারোটা থেকে আজ সকাল অবধি এগিয়েছিল ইণ্টারমিডিয়েট চ্যানেল পর্যন্ত। বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত গিয়েছে কলকাতা থেকে ১২৫ নটিক্যাল মাইল।

সাড়ে সাতটায় আমরা মোহনায় পৌছলাম। গতরাত্রের চাইতে আজ রাত্রে এখানে আরও বেশি জাহাজের ভিড়। খালি চোখে গুণে নিলাম—১১৫। পাইলট জাহাজ না থাকায় অনেক জাহাজ মোহনা ছেড়ে অন্য বন্দরের দিকে যেতে পারেনি, আবার কলকাতাগামী জাহাজও আটকে আছে পাইলট না পাওয়ায়। কেননা, তাঁরা যে আমাদেরই সঙ্গে!

মোহনায় পৌঁছে 'নদীয়ায়' খবর পাঠানো হল, ডিউক-পিনাকী 'সাগরে' চলে আসুক। 'সাগরে'র কর্মীরা এর আগে কাছ থেকে

অভিযাত্রীদের দেখেননি, অভিনন্দন জানাবার সুযোগও পান নি। আজ কাছে পেয়ে 'সাগরে'র কয়েক শ' কর্মী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন। ডেকে, ব্রিজে,—কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। কেউ কেউ আমাদেরও কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে এগিয়ে গেলেন। কম্যাণ্ডার দাশ, ক্যাপ্টেন মোহন, ও ডিউক-পিনাকীকে নিয়ে মিহিরদা সলাপরামর্শে বসলেন। 'শেষবারের মত সব জিনিষ চেক-আপ করে নাও, ম্যাপ দেখ।' এক ঘণ্টার উপর আলোচনা চলল। আমাদের সঙ্গে কোন কথা হল না। মিহিরদা বললেন,—এপারের শেষ প্রেস কনফারেন্স হবে রাত সাড়ে বারোটায়—এপারের শেষ বিদায়ের আগে। এখন ওরা বিশ্রাম নেবে।

ওরা ঘুমুতে গেল। আমরাও চটপট খেয়ে নিলাম। 'কানোজি আংরে' তখন 'নদীয়ার' গায়ে বাঁধা। তখন রাত সওয়া নয়টা। মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বারংবার মনে পড়ছিল—'যেতে নাহি দিব'র কথা। পরক্ষণেই আবার—'যেতে যে দিতে হয়।' ওদের দুজনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নানা ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। নানা চিন্তা এসে ভিড় করছিল। বারোটা বাজতেই সকলে জেগে গেল। উপরে ওয়েটিং রুমে চললাম। ডিউক-পিনাকী হাজির। বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এমন ঠাসা প্রেস কনফারেন্স ইতিপূর্বে হয়নি। পার্থ টেপ রেকর্ডার খুলেছে। ক্যামেরার ফ্লাস জ্বলছে ঘন ঘন। আমাদের নানা প্রশ্ন। জবাব দিচ্ছে লেফটেনান্ট জর্জ ডিউক ও পিনাকী রঞ্জন চ্যাটার্জি।

জিতেনদা আবৃত্তি করলেন, 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু দুস্তর পারবার'। পিনাকী গান গাইল, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'। শেষ গান 'জন-গন-মন'।

এপারে শেষ সংবর্ধনা

ওদের মালায় মালায় ভরিয়ে দিলেন জাহাজের নিম্নতম কর্মী থেকে ক্যাপ্টেন পর্যন্ত সকলে। সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে ওরা দুজন—আগে ডিউক। মুহূর্তের জন্য সে দাঁড়িয়ে গেল আমায় দেখে। দুহাত চেপে ধরল। 'আন্দামানে পৌঁছলে তোমায় থাকতে হবে। কোমলকে সব খবর দেবে।' ওর চোখ টলটল করছে। আমারও গলা ধরে আসছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, কবে যাবো আন্দামানে?

—২৮শে ফেব্রুয়ারি। বলল ডিউক।

ওকে আর বাধা দিলাম না। গো অ্যাহেড। উইশ ইউ গুড লাক। ডিউক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

এবার পিনাকীকে বিদায় জানাবার পালা, কী বলব ওকে! ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এতদিন উৎসাহ দিয়ে এসেছি—বলেছি, জয় তোমাদের হবেই। আর আজ আমি স্তব্ধ। শঙ্খধ্বনি, বিউগিল, পুরুষকণ্ঠে উলুধ্বনি, জাহাজের ভোঁ—কিছুই আমার কানে প্রবেশ করছে না।

ওর দুহাত ধরে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মাথানত করে। পিনাকীই ঘোর কাটিয়ে দিল।—কী হচ্ছে চিরঞ্জীবদা, আজ আপনি কোথায় আমাদের উৎসাহ দেবেন। আপনি না সাংবাদিক, আর আপনার চোখে জল! এতজোরে হাত চেপে ধরল যে, উঃ করে উঠলাম। 'ভুলে না যান তাই এত জোরে, কলকাতায় গিয়ে মাকে ফোন করবেন।' বাইরে তখন হাউই বাজি রং বেরং-এর। দুম্‌দাম পটকা ফাটছে। 'ডিউক, হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে। পিনাকী, হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে।' এবার 'নদীয়া' লম্বা ভোঁ বাজালো, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজও। বঙ্গোপসাগরের

বুকে এমন অনুষ্ঠান কখনও হয়নি। রাত একটায় ডিউক পিনাকী নৌকোয় উঠল। কম্যাণ্ডার দাশও গেলেন।

সামান্য বাতাস বইছে, তাতেই ঢেউ উঠেছে সমুদ্রে। তাপমাত্রা এখন ২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সমুদ্রের অবস্থা—ফোর্স বিউফোর্ট স্কেল-১। এই স্কেলে ছোট ছোট ঢেউই থাকে। কুয়াশা হয় না। চাঁদের আলো উজ্জ্বল, আকাশ তারকাখচিত। আর কম্পাস কোর্স ১৪২ ডিগ্রি থাকা উচিত, কিন্তু ওরা নিয়েছে ১৪৫ ডিগ্রি। ডেক থেকে নীল সমুদ্রের বুকে শুশুক দেখলাম। নাবিকরা বললেন, ওরাও ওই দুই দুঃসাহসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। উপরন্তু এ হল মঙ্গলেরই চিহ্ন।

ওদের নৌকোয় চড়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম সার্চলাইটের আলোয়। কখনও দাঁড় টেনে এগিয়ে চলেছে, কখনও ঘুমুচ্ছে। মাঝে একবার হঠাৎ 'কানোজি আংরে' অদৃশ্য হল। সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ। কোনও বিপদ ঘটেনি তো? স্বাভাবিক প্রশ্ন। বিপদ? কম্যাণ্ডার দাশ থাকতে? 'ফোঃ' বলে উড়িয়ে দিলেন এক পাইলট। এক ঘণ্টা সার্চের পর হদিশও পাওয়া গেল। পরে শুনলাম অতবড় ঢেউ কাটিয়ে সে এমনভাবে চলছিল যে ছোট নৌকো ঢেউয়ের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। ঢেউ কমতেই 'কানোজি আংরে'র দেখা মেলে।

আজ ৬ই ফেব্রুয়ারি। সকাল পাঁচটা। 'কানোজি আংরে' আর আমাদের কাছে আসবে না। তবে ইচ্ছে করলে আমরা ওদের কাছে যেতে পারি, কুশল বার্তা নিয়ে আসতে পারি। সুযোগ আছে যখন, ক্ষতি কি! স্পীড বোট নিয়ে চলে গেলাম কয়েকজন। গত কয়দিনে নদী বা সমুদ্রে যাদের সঙ্গে দেখা হয়নি, আজ তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। প্রথমে ভেবেছিলাম সামুদ্রিক মাছ। কিন্তু 'সাগরে'র এক নাবিকের মুখে ওই জীবদের আসল পরিচয় পেতেই আমার গোটা শরীর যেন হিম হয়ে আসছিল। প্রায় পনের ফুট লম্বা দুটো হাঙর স্পীড বোটের গা ঘেঁসে যেতে যেতে তলা দিয়ে চলে গেল বিরাট হাঁ করে। শুনলাম,

ওদের লেজে যা জোর, তাতে আমাদের স্পীড বোট ঘায়েল হয়ে যেতে পারে, আর 'কানোজি আংরে' তো জল ভাত।

—অ্যাঁ! বলছেন কি।

—হ্যাঁ। যা সত্যি তাই বললাম।

আমার 'কন-টিকি'র কথা মনে পড়ল। হেইয়ের ডালের বইয়ে পড়েছিলাম, তিনি ৫০ ফুট লম্বা আর ১৫ টন ওজনের হাঙর দেখেছিলেন। একটা বাচ্চা হাঙরকে বল্লম দিয়ে মেরে দেখা যায়, মেটেটারই ওজন সাড়ে সাত মণ। তার প্রত্যেক চোয়ালে ছিল তিন হাজারটি দাঁত।

'কানোজি আংরে'র কাছে যেতে ডিউক-পিনাকীকে একটুও অখুশি মনে হল না। বরং তার বিপরীত। কাছে যেতেই ডিউক সাংবাদিকদের উদ্দেশে লেখা তিন স্তবকের একটি কবিতা দিল। লিখেছে রাত ১টা ৪০ মিনিটে।

তার পাঁচটি পংক্তি :

"Out at sea
In our little Dinghee
By the moonlight
We write this message
Of thanks to thee."

প্রেমিকার জন্য লেখা একখানা চিঠিও সে দিল আমার হাতে।

আমরা তখন কলকাতা থেকে ৩৭ সমুদ্র-মাইল দূরে। কাল রাত থেকে আজ সকাল ছয়টা পর্যন্ত গিয়েছে ছয় মাইল। পূবের আকাশ মেঘলা, পশ্চিম পরিষ্কার, নীল। সাগরে আকাশে একাকার। আর একটা স্পীড বোট এল। তাতে মিহির সেন, ক্যাপ্টেন মোহন ও কয়েকজন সাংবাদিক। গত পাঁচ দিনের কর্ণধার কম্যাণ্ডার দাশ উঠে এলেন। তারপর মিহিরদা পিস্তল সংকেত দিলেন। সমুদ্রে তখন ওই ছোট ডিঙির উপরে সভ্যজগতের মাত্র দুটি প্রাণী। ওরা এগিয়ে চলল।

কানোজি আংরে

আমরা ফিরে আসছি। ফিরে জাহাজে উঠলাম। শুরুতে খালি চোখেই দেখছিলাম 'আংরে'কে, ডিউক-পিনাকীকেও। এবার আর অভিযাত্রীদ্বয়কে দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখছি নৌকো আর মাস্তুল এবং মাস্তুলের পতাকা। বায়নাকুলারেও কিছুক্ষণ দেখলাম; ওরা দুজন শুয়ে। নৌকো ভেসে চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে; তারপর মোচার খোলার মত ভাসতে দেখলাম, তারও পরে একটি রেখা। অতঃপর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ডিউক-পিনু, 'কানোজি আংরে'।

রুশ জাহাজে কলকাতায়

এবার মোহনা থেকে কলকাতায় ফেরার পালা। আবার হুলুস্থুল ব্যাপার। কলকাতাগামী একটি রুশ জাহাজে বার্তা পাঠান হল—তারা কয়েকজন সাংবাদিককে নিতে পারবেন কিনা।

—পারব। তবে চারজনের বেশি নয়।

ওয়ারলেসে খবর পেতেই তল্পিতল্পা নিয়ে স্পীড বোটে নেমে পড়লাম। আধ মাইল দূরে রুশ জাহাজটি রয়েছে। সেখানে যেতে হবে। শংকর, বিজন, মানস ও আমি চললাম রুশ জাহাজের দিকে। স্থির হল বাকি সাংবাদিকরা অন্য জাহাজে কলকাতায় ফিরবেন।

রুশ জাহাজের গায়ে নৌকো ভিড়তে ওই জাহাজের তিন জন কর্মী নৌকোয় নেমে এলেন। ইসারায় বোঝালেন ব্যাগ, বাক্স তাঁরাই নিয়ে যাবেন। আমাদের ভাবতে হবে না।

ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ওদের ক্যাপ্টেন। একদম ইংরাজি জানেন না। কয়েকটি মাত্র কথা বললেন সেকহ্যাণ্ড করার পর 'ইউ রিপোরতার, নিউজপেপার; ইন রাশিয়া, প্রাভদা বিগ নিউজপেপার। ইনদিয়া-

রাশিয়া ফ্রেন্দ্‌'। বিজন মিলিটারী কায়দায় করমর্দন করে 'হিন্দী-রুশী ভাই ভাই' বলল।

এটিও পুরো এয়ারকাণ্ডিশান্‌ড জাহাজ। কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা। ভিতরটা দেখলে মনেই হয় না, জাহাজে চড়েছি। 'সাগর'এর চাইতেও ভাল। কেবিন দেখিয়ে দিলেন একজন অফিসার। কেবিনে গিয়ে গা এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ 'ঠক্‌ঠক্‌' শব্দ দরজায়! 'ইয়েস' বলে মানস দরজা খুলে অবাক। সাদা স্কার্ট, চুলে লাল ফিতে। মানসের চাইতেও ফর্সা একজন মহিলা 'গুডমর্নিং' জানালেন। বিজন, আমি, শংকর থ। মানস বোধহয় হতভম্ব হয়েছিল দরজা খুলেই, যতই কাঁচা বয়স থাকুক, খবরের কাগজের লোক, তাও আবার স্টেটসম্যানের রিপোর্টার; পরমুহূর্তেই সামলে নিয়েছিল নিজেকে।

দুজনের মধ্যে যা কথা হল, তা থেকে মনে হল, মানস সায়েবী কায়দায় বিজনের নির্দেশে বলছে, স্কচ চাই।

আটটা বেজে গেল, চা পর্যন্ত পেটে পড়েনি। আর এই সাত সকালে স্কচ?—আমার কথা শেষ না হতেই বিজন খঁকিয়ে উঠল। তুই বোঝস কি! এইডাই নিয়ম। রাশিয়ানরা আমাগো মতন না। বুইঝা সুইঝা খায়। তাই অমন স্বাস্থ্য। চা-ঠা পরে হইবো। আগে হুইস্কী হউক। মানস: বাবা, গুরু, আমি এসবের মধ্যে নেই। কখনও ওসব টাচ করিনি। একটা কিছু হয়ে গেলে কী বলবো।

শংকর বলল, তোমার বাবা মা তো দিল্লিতে, কলকাতায় কে বুঝবে! কে জানবে!

দশমিনিটের মধ্যে চারটি বড় বোতল্‌ হুইস্কি, সোডা, লেমনেড ইত্যাদি টেবিলে হাজির। বিজন ধমক লাগাল মানসকে, সব মাটি হইয়া গেছে। রাশিয়ান জাহাজে ভট্‌কা থামু, হুইস্কী ক্যান্‌? ডাক দেখি মহিলারে।

মানস দরজা খুলে স্টোরের দিকে যাচ্ছিল—মাঝ পথেই দেখা হল সেই

মহিলার সঙ্গে। ভদকার কথা বলতে তিনি জানান, রুশরা বিলিতি মদ খুব পছন্দ করে, ভদকা নেই সঙ্গে।

বিজন ও শংকর সকলকে হারিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি এসে জানিয়ে গেলেন ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত। ডাইনিং হলে যেতে হবে।

চমৎকার সাজানো। ডাইনিং হলে রেডিও, নানা পত্র পত্রিকা রয়েছে। তবে সবই রুশ দেশের। ব্রেকফাস্টের আয়োজন দেখে চক্ষু ছানাবড়া। কফির পটগুলোও অবাক করে দিল। একজন লোকের পক্ষে এত খাওয়া সম্ভব? বিজন আবার মুখ খুলল: ভালবাইসা দিতাছে, খাইয়া লও। রাশিয়ান জিনিষে ভেজাল নাই।

আমি ভাবছিলাম কোনটা রেখে কোনটা খাবো। ব্রেকফাস্টে পুডিংও আছে, আইসক্রীম, ফ্রুটস স্যালাডও, এদিকে কফি। বাঁদিকের টেবিলে বসে দুজন রুশ আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। সেই মহিলাকে ডাকা হল। বিজনের আবার নেতৃত্ব। ইংরাজি, হিন্দী এবং ওর দেশী ভাষা, আর ইসারায় বোঝাবার জন্য এমন অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলো যেন রুশ মহিলাটিকে সে সব বোঝাতে পারছে। তাঁর মুচকী হাসি আর মাথা নেড়ে 'ইয়েস ইয়েস' কথাতে মনে হল তিনিও সব বুঝেছেন। শংকর নস্যি নাকে গুঁজে মহিলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, একটি ঘোড়ার ডিম। —'হোয়াট?' 'অশ্বের ডিম্বো'। আমরা হাসি চাপতে পারিনি। দেখি তিনিও হাসিতে লুটোপুটি যাচ্ছেন।

খাওয়া শেষ হতেই সলাপরামর্শে বসলাম। এত আদর যত্ন তো করছে, বিল কত উঠছে কে জানে! সঙ্গে যা টাকা আছে তাতে কুলোবে তো! মানস, শংকর ও আমার সর্বসম্মত প্রস্তাবে স্থির হল বিজন ক্যান্টিন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে যেন কিছু কনশেসন করে নেয়। ক্যান্টিন ম্যানেজারের কাছে সে গেল বটে, কিন্তু কিছুই বোঝাতে পারল না, সে কি বলতে চায়। অতঃপর স্মরণ নিতে হল সেই মহিলার। রিক্রিয়েশন রুমে বসে তখন কথা হচ্ছে। তিনি হাত নেড়ে বললেন, 'নো মানি,

নো রুপী, ইউ গেস্ট।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিজন আবার বলল, 'ইউ রাশিয়ান, উই ইণ্ডিয়ান ভাই-ভাই'। শংকর সংশোধন করল, 'ভাই-ভাই না, ভাই-বোন'। আমি বললাম, তাও না। উনি আমাদের চেয়ে বড়। রাশিয়া ইণ্ডিয়া দিদি-ভাই। 'দিদি' কি, বোঝাতেই আরও পাঁচ মিনিট লাগল। রিক্রিয়েশন রুমের টেলিভিশনটা চালু করার চেষ্টা হল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কোন স্টেশন পাওয়া গেল না। সময় দেখে হিসেব কষে সেই 'দিদি' জানালেন, এখন সব স্টেশন বন্ধ। কোন প্রোগ্রাম হচ্ছে না।

ওরা কেবিনে চলে গেল। আমি ডেকে বেড়াতে গিয়ে দেখি নানান জনে নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ ছুতোরের কাজ করছে খালি গায়ে, কেউ রং লাগাতে ব্যস্ত, আবার একজন একটি যন্ত্র নিয়ে ঘেমে নেয়ে গিয়েছে। এক কোণে বসে জনা পাঁচেক মিলে কড়ি খেলছে। আমাকে দেখেই বসতে দিল। ওদের কথা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু খেলা দেখে বুঝলাম কৈশোরে আমরা ওসব খেলতাম।

জাহাজের প্রপেলারের দিকে তখন শ'খানেক গাংচিল উড়ছে আর জলে পড়ছে মাছ ধরতে। জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাদের অনুসরণ করছে। এবার ব্রিজের উপরে গেলাম। পাইলট জাহাজে দেখেছিলাম, টেলিফোনে ব্রীজ থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, খবর পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন অফিসারের কাছে। রুশ জাহাজে টেলিফোন নেই। 'ওয়াকি-টকিতে' কথা বলছেন সকলে। প্রত্যেকের কাছে একটি করে 'ওয়াকি-টকি' রয়েছে। সাধারণ একটি মালবাহী জাহাজের সরঞ্জাম দেখেই বুঝলাম ওরা বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে কত উন্নত!

অবাক করে দিলেন ব্লাডিভোস্টকের সিমানোভিচ টিগর। উনি এই জাহাজের চিফ অফিসার। মস্ত কেবিন। জাহাজ থেকেই তিনি টেলিফোনে ব্লাডিভোস্টকের মেসার্স 'জেটুশী'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে রুশ-হিন্দী ও রুশ বাংলা অভিধান রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র আর মুল্‌করাজ আনন্দের কিছু বইয়ের রুশ সংস্করণও দেখালেন। কলকাতায় দর্শনীয় কি কি আছে তাও ওঁর নখদর্পণে। তবে উনি দেখবেন তিনটি জিনিষ, কালিঘাটের মন্দির, রবীন্দ্রনাথের বাড়ি আর যদি কোথাও আর্ট একজিবিশন চলে, সেটি।
দুজনে জমিয়ে বসেছি। ওঁর বড় ছেলে লেনিনগ্রাডে পড়ছে, কয়েক বছরের মধ্যে সে মহাকাশে যাবে। বড় মেয়ে অধ্যাপিকা। বিয়ে হয়নি। এবার দেশে ফিরে বিয়ে দেবে। আগে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া লাগতো, স্বামী বছরের নয় মাস জলে কাটায় বলে। এখন স্ত্রী কিছু বলে না। কারণ সিমানোভিচের ছোট ছেলে আরও দুঃসাহসী। সে সাবমেরিণের পাইলট।

জাহাজে হঠাৎ হৈচৈ। সিমানোভিচ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন আমায় বসিয়ে রেখে। ক্যাপ্টেন অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন এক্ষুণি 'এস ও এস' পাঠাও কলকাতায়। একজন সাংবাদিক নিখোঁজ। নিখোঁজ? শুনে আমরা অবাক। তিনজন কেবিনের দরজা বন্ধ করে হুইস্কী শেষ করছে, আমি চিফ অফিসারের ঘরে। হারিয়ে গেল কে? পরে জানলাম, আমাকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই মহিলাটি সব গোল বাধিয়েছিলেন আমাকে কেবিনে না ডেকে দেখতে না পেয়ে। আমাদের কেবিনে তখন মানস ঘুমুচ্ছে। জেগে বিজন ও শংকর। কিন্তু সে জাগার চাইতে ঘুমিয়েও মানসের হুঁস রয়েছে বেশি।
এরই মাঝে ডিনারের সময় হয়েছে বলে আর একজন মহিলা খবর দিয়ে গেলেন। আবার কেবিন ছেড়ে যেতে শংকর নারাজ। মহিলাটিও বুঝেছিলেন, ডাইনিং হলে যাওয়ার পথে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, কয়েকজনের যা অবস্থা। আমাদের কেবিনেই তাই প্লেট নিয়ে এলেন।

খাদ্য বস্তুটি কি বুঝলাম না। মহিলাটি খাদ্যের যে নাম বললেন তা আমাদের চারজনের ৪ × ১৪ = ৫৬ পুরুষেও শুনেছেন কিনা সন্দেহ। তবে দেখে মনে হয় গম বা বজরা সিদ্ধ। কিন্তু আবলুস কাঠের মত রং। প্রত্যেককে প্রায় আধ কিলো বা তারও বেশি ওজনের এক খণ্ড করে মাংস। হাড় নেই। তেল, নুন, ঝালেরও বালাই নেই। কীসের মাংস তাও বোঝা গেল না। তবে বীফ, মাটন বা হ্যাম নয়। বজরা বা ঐ গম সিদ্ধ থেকে আরশোলার গন্ধ। মানস একটু মুখে দিয়েই 'ওয়াক থু' বলে রেখে দিল, কিন্তু শংকর ও বিজন 'নাইস' বলে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। আমার ভাল লাগল আনারস। দশ কিলো ওজনের একটি আনারস চারখণ্ড করে চারজনকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমরা ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি।

বিজন বাইরের থেকে ঘুরে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কইতে পারো, রাশিয়ানরা ভেনাসকে কেন পছন্দ করে! আমি বললাম, ও সম্পর্কে মানসের পড়াশোনা বেশি, সেই বলুক। হঠাৎ ভেনাস প্রসঙ্গ কেন? বিজন কানের কাছে এসে বলল চুপি চুপি—চমৎকার মূর্তি আছে ছাদের উপর, দেইখা আইস।

নেহাত সাংবাদিক, ওদের অতিথি এবং জাহাজটি আমাদের দেশের সীমানায়। রুশ দেশে হলে হয়তো হাজতে যেতে হত। বিজনের কথা মতন ছাদে গিয়ে দেখছিলাম, এক রুশ মহিলা গায়ে তেল মেখে শুধু একটি জাঙিয়া পরে ডেকের উপর শুয়ে আছেন। রোদ পোহাচ্ছেন। চৌহদ্দীতে কোন পুরুষ নেই। তিনি আমায় দেখে নি—এই যা বাঁচোয়া। না হলে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেত। পরে জানতে পারি, উনি ক্যাপ্টেনের স্ত্রী।

সাড়ে তিনটেয় কলকাতায় হেস্টিংসের কাছে জাহাজ নোঙর করল। আমরা ওদের 'গুড বাই' জানিয়ে নেমে এলাম। সেখান থেকে সরাসরি চারজন স্ব-স্ব অফিসে।

সাগর থেকে ফিরেও রেহাই নেই। ভেবেছিলাম গত ক'দিন বিশ্রাম পাইনি, অন্তত দিন দুয়েক ফাঁকি দেব। তা আর হল না। আনন্দ বাজারে ফিরে সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ ও বার্তা-সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, 'কানোজি আংরে' সম্পর্কে রোজ খবর চাই।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জো। আগেই বলেছি, ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে যে ওয়ারলেস রয়েছে তাতে ওরা শুধু 'এস ও এস' বা 'ওকে' ছাড়া আর কোন খবর পাঠাতে পারবে না। খবর পাঠাতে পারবে—যদি আন্দামানের পথে কোন জাহাজের দেখা পায় এবং সেই জাহাজ থেকে যদি স্পীড বোটে কেউ ওদের কাছে গিয়ে কুশল বার্তা নেয়। কাছে না গেলেও পতাকা মারফৎ সিগন্যাল দিয়ে খবর জানাতে পারবে।

আমি 'না' বলতে পারলাম না। যে ভাবেই হোক খবর যোগাড় করতে হবে। সাধারণতঃ কলকাতার পোর্ট ওয়ারলেস ম্যান ও' ওয়ার জেটি থেকে মোহনা পর্যন্ত সব খবর রাখে। তারপর আর কোন যোগাযোগ নেই তাদের। তবে বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে কোন খবর মোহনায় পৌঁছালে কলকাতায় তা পেতে কোন কষ্ট হবে না। পোর্ট ওয়ারলেসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু প্রথম দিন অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে যখন ওদের বিদায় জানিয়ে চলে এলাম, যেদিন 'কানোজি আংরে'র সত্যিকারের অভিযান শুরু হল, যেদিন ওরা এপারের চেনা মুখগুলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করল—সেদিন বিকালে কোন খবর পেলাম না। রাত এগারটা পর্যন্ত পোর্ট ওয়ারলেসের সঙ্গে কথা বললাম। উত্তর, 'না কোন খবর আসেনি।' পাইলট জাহাজ 'সাগর'ও খবর পাঠায়নি। তবুও ৭ই ফেব্রুয়ারির কাগজে আগের দিনের ভোরবেলাকার মোহনা থেকে বিদায়ের খবর দিয়ে মুখরক্ষা হল। কিন্তু তারপর?

৭ তারিখে অফিসে ফিরে মিহির সেন ও কম্যাণ্ডার দাশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে বিফল হলাম। ওঁরা কেউ কলকাতায় ফেরেন নি। সারাদিন বিভিন্ন সূত্রে 'কানোজি আংরে'র খবর নেওয়ার চেষ্টাও বিফল হল। রাত এগারটায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তার একটু আগে ওঁরা দুজন মোহনা থেকে কলকাতায় ফিরেছেন। এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ ওঁরা দুজন স্পীড বোটে চড়ে ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে শেষ দেখা করে এসেছেন। কাল বিকালেও একবার দেখা হয়েছিল।

মাঝ দরিয়ায় কখন কী ভাবে থাকবে ওরা, সঙ্গে ঘড়ি, ডায়েরি ইত্যাদি থাকলেও দিনক্ষণের হিসাব রাখা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই কম্যাণ্ডার দাশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি পন্থা বলে দিয়ে এসেছেন। 'রোজ সকালে উঠে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আংরে'র গলুইয়ে দাগ কাটবে। তাহলে হিসাব করতে কষ্ট হবে না, আজ কত তারিখ। কলকাতা থেকে ক'দিন আগে রওনা হয়েছ।' ৬ই ফেব্রুয়ারি বিকালে কঃ দাশই ছুরি দিয়ে গলুইয়ে ছয়টি দাগ কেটে দেন। অর্থাৎ অভিযানের সেদিন ষষ্ঠ দিবস। (ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১লা ফেব্রুয়ারি)।

মিহির দা বললেন, আজ 'সাগর'-এ ওয়ারলেস এসেছে ইণ্ডিয়ান নেভির একটি জাহাজ থেকে; সকাল আটটায় তাদের সঙ্গে 'কানোজি আংরে'র দেখা হয়েছে। দুর থেকে 'আংরে'কে দেখে ওঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এই নৌকোয় চড়ে যাচ্ছে সেই দুই দুঃসাহসী। বলা বাহুল্য, অভিযাত্রীদ্বয়ের অন্যতম নৌ-বাহিনীর অফিসার। ডিউকও সিগন্যাল দিয়েছিল জাহাজ দেখে, পতাকা নেড়ে। সে ওই জাহাজেও কাজ করেছে। অনেকেই তার চেনা, ঘনিষ্ঠও। তাই ৭ই ফেব্রুয়ারির সকালের খাওয়া ডিউক-পিনাকীকে নিজেদের মজুত থেকে খেতে হয়নি। নেভির ওই জাহাজ থেকে অফিসাররা স্পীড বোটে চড়ে

ওদের ব্রেকফাস্টের খাবার দিয়ে আসেন। অফিসাররা অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'তোমাদের জয় হবেই, এগিয়ে চলো।'

মিহিরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা গতকাল এলাম; অথচ আপনাদের দুজনের আসতে দেরী হল কেন?

ওঁর উত্তর: গতকাল দুপুরের দিকে ওরা ওয়ারলেস চালুর চেষ্টা করে। কিন্তু যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। বিকালে গিয়ে কম্যাণ্ডার দাশ ওয়ারলেস মেরামত করে গণ্ডগোলটুকু মিটিয়ে দেন। ওরা তারপর কাছাকাছি জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। কম্পাসও মেরামত হয়ে গিয়েছে।

মিহিরদা আবার বললেন, ওদের অভিযান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভুল খবর বের হয়েছে। ওরা আন্দামান যাচ্ছে অর্থাৎ আন্দামানের যে কোন দ্বীপে পৌঁছালেই অভিযান কার্যতঃ শেষ হবে। পোর্টব্লেয়ারে না পৌঁছালেও চলবে।

আগের দিনে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট সম্পর্কেও তাঁকে ক্ষুণ্ণ মনে হল। আমি সমালোচনা করেছিলাম ওয়ারলেস সেটের; দূরপাল্লার ওয়ারলেস বলে নয়, সেটটিও গোলমাল করছিল। তাছাড়া নৌকোর গায়ের রং আর সমুদ্রের নীল জলে কোন ফারাক ছিল না। সমুদ্রে ঢেউ উঠলে তো মোচার খোলার মত ওই নৌকোকে দেখা যাবেই না, এমন কি শান্ত অবস্থাতেও দূর থেকে চেনা কষ্টকর। তাছাড়া মাস্তুলের যে লাল আলোটি জ্বলবে রাত্রে তাও টিমটিমে। দূর থেকে দেখা যাবেনা। নৌবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও আমি পরে এ নিয়ে আলোচনা করি। তাঁরা সংক্ষেপে বললেন, অতশত ব্যবস্থা থাকলে অ্যাডভেঞ্চারের মানে কি!

অ্যাডভেঞ্চারে তো ঝুঁকি থাকবেই। প্রতিমুহূর্তেই জীবনের ঝুঁকি। অর্থাৎ 'মরিতে চাহি না' নয়—'মরণরে তুহুঁ মম…' করে নিয়েই লোকে অভিযানে যায়।

মাঝ রাতে কম্যাণ্ডার দাশের আর একটি টেলিফোন পেলাম—'ওরা আজ সকালে গলুইয়ে আর একটি দাগ কেটেছে।' অর্থাৎ অভিযানের আজ সপ্তম দিন।

আন্দামান অভিযান নিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় সেদিন 'দুই অভিযাত্রী' শিরোনামায় সম্পাদকীয় লেখা হল :

"সে কোন্ তরণী, যাহার অমল ধবল পালে মন্দ-মধুর হাওয়া লাগিতে দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন— দেখি নাই কভু, দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া? প্রশ্নের সহজ উত্তরটি যাহা মনে আসিবে তাহা এই যে, কবি জীবন-তরণীর কথা বলিয়াছেন। জীবনেরই একটি গূঢ় বিস্ময়ের রূপ কবির কল্পনায় চিত্রিত হইয়াছে। সেই চিত্রের সঙ্গে যে তত্ত্বের ভাব শোভা মিশিয়া আছে, তাহা জীবনেরই তত্ত্ব। সংসার হইল সাগর, এবং মানুষের জীবন হইল সেই সাগরের জলে ভাসিয়া চলা একটি তরী; বিশ্বের প্রায় সকল কবির কল্পনাতে এই রূপকটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদের ঝঞ্ঝাবাত আছে, আবার আশার সুবাতাসও আছে; সাগরের মত সংসারও দুই বিরোধী বৈচিত্র্যের সমাবেশ। যেমন সাগরে দেখা যায়, তেমনই সংসারেও দেখা যায়, দিগ্বলয়ে অরুণাভা জাগিতেছে, আবার রাত্রির আকাশের শেষ তারাটিও ঘন মেঘে ঢাকা পড়িতেছে। জীবনতরণী কখনও হর্ষে বা উল্লাসে দুলিয়া ওঠে, কখনও বা নৈরাশ্যে দিশাহারা হয়। ইহার মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য এই যে, চলিতেই হইবে, থামিয়া থাকিতে পারা যাইবে না।

সুতরাং অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, পৃথিবীর ইতিহাসের প্রত্যেকটি দুঃসাহসিক নৌযাত্রা যেন মানবজীবনেরই জয়যাত্রার প্রতীক। মানবজীবনের যাহা সহজ আবেগ, যাহা অজানাকে সন্ধান করিয়া জানিয়াছে, যাহা বিপুল দুঃসাহসের পরীক্ষা স্বীকার করিয়া আকাঙ্ক্ষিত উপকূলের কোলে পৌঁছিবার চেষ্টা জাগ্রত করিয়াছে,

তাহার সবচেয়ে স্পষ্ট ও সার্থক প্রতিচ্ছবি আজিকার অনেক অভিযাত্রার ঘটনাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই সব নিতান্তই শখের অভিযাত্রা; কেহবা বলিবেন খেয়ালী দুঃসাহসের খেলা। কিন্তু ইত্যাকার ধারণা ও মন্তব্যের কথাতেও মূল সত্যটির কোন বিকার হয় না। যাহা জীবনের একটি সহজ আবেগ, তাহাই প্রত্যেকটি অভিযাত্রার প্রেরণা। যে প্রেরণা স্তিমিত হইলে জীবন তাহার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য হারাইবে, অভিযাত্রিকেরা তাহাকেই নূতন করিয়া ঘটনায় প্রমূর্ত করিয়া তোলেন। ডিউক এবং পিনাকী, দুই দুঃসাহসিক তরুণ একটি ক্ষুদ্র তরণীর নাবিক হইয়া এবং সাগরজলে ভাসিয়া আন্দামান দ্বীপের উপকূলের দিকে চলিয়াছেন।

মঙ্গলকাব্যের সাধু ও সওদাগরকে সাগর পার করিয়া পরদেশের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিত 'চৌদ্দডিঙা মধুকর'। রূপকথার রাজকুমার ময়ূরপঙ্খী নায়ে চড়িয়া প্রিয়ার দেশের নদীর ঘাটে পৌঁছিয়াছেন। এই নৌযাত্রার মধ্যে বিস্ময় বৈচিত্র্য এবং কিছু দুঃসাহসও নিশ্চয় আছে। কিন্তু যাহা ইচ্ছা করিয়া বিপদের কঠোর পরীক্ষাকে আহ্বান করিয়া এবং একটি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া সমুদ্রযাত্রার প্রয়াস, তাহা রূপে রিক্ত হইলেও ঐশ্বর্যে চৌদ্দডিঙা মধুকর ও ময়ূরপঙ্খী নায়ের জলযাত্রার চেয়ে অনেক বড় এবং অনেক মহৎ। তাই বিস্ময়ের কিছু নাই যে, নদীর দুই তটের মানুষ শঙ্খধ্বনি করিয়া এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া দুঃসাহসিক দুই অভিযাত্রীকে অভিনন্দিত করিয়াছে।

প্রবীণ বিপ্লবীদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবি ওই 'অমল ধবল পালে লেগেছে' গানটি বিশেষ একটি ঘটনাকে অভিনন্দিত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে জাহাজ-বোঝাই হইয়া অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার রায়মঙ্গলের নিকটে পৌঁছিয়াছে, বিপ্লবীরা স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রবল করিবার সম্বল পাইবেন, কবি নাকি এই সংবাদ বিশেষ এক নেতার নিকট হইতে জানিবার পর ওই গানটি লিখিয়াছিলেন। ইহা

প্রকৃত তথ্য কি না, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। কিন্তু কোন সন্দেহ নাই যে, ডিউক এবং পিনাকীর অভিযাত্রা নিতান্ত সামান্য—সাধারণ আমোদমূলক ঘটনা নহে। কবিদের শুভেচ্ছার গীতিকা ইঁহাদেরও প্রাপ্য। এবং অদ্ভুত বিস্ময়েরই ব্যাপার বলিতে হইবে, যে-দেশে সামান্য ও বাজে রাজনৈতিক ঘটনার আবেগ লইয়া কবিতা ও ছড়া রচনা করিবার মহোৎসব জাগে, সে-দেশের তরুণের দুঃসাহসিক অভিযাত্রাকে শুভেচ্ছা নিবেদন করিয়া দুই-চারিটা কবিতা মুখরিত হয় না।"

আসল অভিযান শুরু : যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

আজ ৮ই ফেব্রুয়ারি। পি, পিপ্, পিপ্, পি পি…। ওয়ারলেসে 'কানোজি আংরে' থেকে খবর আসছিল। হঠাৎ 'আংরে'র ওয়ারলেস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অভিযাত্রীদ্বয় সকাল পৌনে দশটায় খবর পাঠাচ্ছিল। কিন্তু তার মাঝে একটি জাহাজের বেশি শক্তি সম্পন্ন ওয়ারলেস বাধা দিল। ওরা বিস্তারিত খবর কিছুই দিতে পারেনি। এদিন সকালে উঠেই পিনাকী নৌকোর গলুইয়ে একটি দাগ কেটেছে। আজ অভিযানের অষ্টম দিন।

সমুদ্র শান্ত। সামান্য উত্তুরে হাওয়া বইছে। গতিবেগ ঘণ্টায় সাত আট মাইল। 'কানোজি আংরে' আরও ২৫ মাইল এগিয়েছে, অর্থাৎ কলকাতা থেকে রয়েছে তারা ১৮১ সমুদ্র-মাইল দূরে।

এই সংক্ষিপ্ত খবরে মন ভরেনি। সারাদিন টেলিফোনে খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম। পোর্টকমিশনার্স, নেভি, এয়ারফোর্স, ইণ্ডিয়ান শিপিং

কর্পোরেশন কেউ আর কোন খবর দিতে পারলেন না। দুপুরে পোর্ট-ওয়ারলেস ওই সামান্য যা দিয়েছিলেন তাই নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এদিকে বিভিন্ন স্থান থেকে টেলিফোন আসছে—'আংরে' কতদূর, ডিউক-পিনাকী কেমন আছে ইত্যাদি।

রাত তখন দশটায়, কি খেয়াল হল জানিনা। হঠাৎ অফিসের টেলেক্স রুমে ঢুকলাম। আমাদের পোর্ট ব্লেয়ারের সংবাদদাতা সমর সোমের পাঠানো ছোট একটি খবর আসছে তখন। মেশিনের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম। তিনি লিখছেন—গতকাল রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অভিযাত্রীরা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সাড়ে ছয় শ' মাইল দূরে ছিল। আবহাওয়া বেশ ভাল। ওরা এগিয়ে আসছে আন্দামানের দিকে।

ইতিমধ্যে একজন ইউ এন আই-এর টেলিপ্রিণ্টার মেশিন থেকে এক চিলতে নিউজ দিয়ে গেলেন। মিহিরদার একটি বিবৃতি। নৌকোর রং সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে সমালোচনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রং নিয়ে কোনরকম মতদ্বৈধতা নেই। বিমান থেকে 'আংরে' কে চিনতে অসুবিধা হবে না। মাস্তলে যে আলোটি জ্বলছে, সমুদ্রে সাতমাইল দূর থেকেও তা দেখা যাবে।

৯ই ফেব্রুয়ারি। আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচন। নির্বাচনের দামামার মধ্যেও দেখি অনেকেই 'কানোজি আংরে'র খবর নিতে আনন্দ-বাজারে হাজির, টেলিফোনও আসছে। কিন্তু তাদের কাউকে খুশি করতে পারলাম না। পিনাকীর বাড়ি থেকেও একাধিক টেলিফোন এল। 'না কোন খবর নেই'—দুপুরে জানিয়ে দিলাম। সকাল পৌনে ছটায় 'কানোজি আংরে' থেকে একবার খবর দেওয়ার কথা। পোর্ট ওয়ারলেস 'মুক্ত' ছিল। কিন্তু পিপি, পিপ্ পিপ্ পি—কোনও শব্দও শোনা যায়নি।

আগেই বলা ছিল, সকালে কোন কারণে খবর দিতে না পারলে রাত্রে দিও। সেই অনুযায়ী রাত পৌনে দশটায়ও পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়ারলেসটি খালি রাখা হল। কিন্তু আজ রাত্রেও খবর পাওয়া গেল না। সতীর্থ সাংবাদিক বন্ধুদের প্রশ্ন 'কেমন আছে ওরা?'—এর উত্তর দিতে হবে ভেবে লুকিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কেবল আবহাওয়া অফিস থেকে জানলাম—আবহাওয়া ভাল রয়েছে। আকাশ-বাণীও ডিউক-পিনাকীর জন্য বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন প্রচার করছে।

সমুদ্র যদি শান্তই থাকে, তাহলে ওদের খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জবাব দিলেন মিহির দা, সম্ভবত ওরা এখন মোহনা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

১০ই ফেব্রুয়ারিও একই অবস্থা। কোনও খবর পওয়া গেল না। খবর প্রাপ্তির যতগুলো সূত্র আছে—সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানীতে খবর নিলাম, তাদের যেসব জাহাজ আজ বঙ্গোপসাগর থেকে কলকাতায় বা মোহনায় এসেছে তারা কেউ 'কানোজি আংরে'কে দেখেছে কিনা। সকলের উত্তর 'না'। মিহিরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনিও খবর পান নি। পিনাকীর মা, বাবা, ভাই, বোন এমন কি যে চাকরটি 'পিনু দাদাবাবুকে' কোলে করে মানুষ করেছে সেও অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে। ওরা রিসিভার তুলতেই আমার কণ্ঠ শুনে সেই এক প্রশ্ন—পেলেন কোনও খবর?

বারোটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। দুপুরে আকাশ পরিষ্কার ছিল, বিকালেও। সন্ধ্যায় চাঁদও ছিল আকাশে। কিন্তু রাত দশটা নাগাদ আকাশময় ঘন কালো মেঘ। বৃষ্টিও হল এক পশলা। কিন্তু ঝড়টাই বেশি।

বের হয়েও ফিরে গেলাম অফিসে। 'কলকাতায় তো এই রকম,

বঙ্গোপসাগরের দিকে অবস্থা কেমন?' আবহাওয়া অফিস জানাল, বঙ্গোপসাগরের দিকে এ ঝড় হয় নি। তবুও মন মানেনি।

১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে খবরের কাগজগুলো আসতে স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার শেষ করে যুগান্তরে হাত দিতেই দেখি প্রথম পৃষ্ঠায় ডিউক-পিনাকীর ছবিসহ তিন কলমের সংবাদ শিরোনাম 'দশদিন কেটে গেল, পিনাকী কোথায়?' সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের মানচিত্র, কলকাতা থেকে আন্দামান পর্যন্ত 'কানোজি আংরে'র সম্ভাব্য গমন পথ, মহাকাশে তারকাপুঞ্জের অবস্থানও দেখান হয়েছে।

আনন্দবাজারে ওদের সম্পর্কে নিত্য সংবাদ থাকলেও যুগান্তরের অত বড় খবরটিতে—'পিনাকী কোথায়?' প্রশ্নে নির্বাচনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া 'কানোজি আংরে' প্রসঙ্গ আবার সকলকে দাগা দিল। সকলেই উৎকন্ঠিত।

দুঃসাহসী মিহির সেনও চিন্তিত। মুখে 'ওরা ভাল আছে' জানালেও যে কোনও উপায়ে ডিউক-পিনুর খবর পেতে চান।

দুপুরে শুনলাম, বঙ্গোপসাগরের বুকে যেসব জাহাজ আছে বা যারা 'কানোজি আংরে'র সম্ভাব্য পথে আসবে, তারা যেন ওদের খবর নেয়—সব জাহাজকে এই ধরণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মিহিরদা দিল্লীতে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল এ. কে. চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, সংযোগ স্থাপন করেছেন বিমান বাহিনীর সঙ্গেও। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যেসব সামরিক বিমান যাবে তারা নীচের দিকে নেমে গিয়ে যেন খবর নেয়। অনুরূপ নির্দেশ গিয়েছে যাত্রীবাহী বিমান সংস্থাগুলিতেও।

কি খেয়াল হল জানিনা। বিকালে ফটোগ্রাফার নিয়ে কালীঘাটে সদানন্দ রোডে পিনাকীদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিন তলায় উঠতেই পিনাকীকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে যে—সেই 'পুরাতন ভৃত্য' মাতবরের সঙ্গে প্রথম দেখা।

'পত্রিকার লোক! দাদাবাবুদের খোবোর পেলেন কিছু?' ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল মাতবর। আমার পরিচয়ে আঁৎকে উঠেছিল সে। গত কয়েকদিন ধরে সেও আন্দামান অভিযাত্রীদের খবর রাখছে প্রতি মুহূর্তে। টেলিফোন এলেই কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—এই বুঝি খবর এল।

১১ই ফেব্রুয়ারী তখন নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য সারা কলকাতা যখন ভেঙে পড়েছে; দক্ষিণ কলকাতার ৬৮, সদানন্দ রোডের তিনতলায় তখন নিস্তব্ধতা।

—না। এই মুহূর্তে কোন খবর নেই।

আমার কথা শুনে নিরাশ হয়ে মাতবর ওর মাঈজীকে ডাকতে গেল। ইতিমধ্যে পিনাকীর বোন শুক্লা এসেছে। 'দাদার খবর পেয়েছেন বুঝি!'

কোনও কথা বলিনি। শুধু ঘাড় নাড়লাম। শুক্লা আমাদের বসতে বলে চলে গেল। পিনাকীর মা নিলিমা দেবী এলেন।

—পিন্টুর কোন খবর আছে? ওঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তাঁর ছল ছল আঁখি মুহূর্তমধ্যে টলমল। 'শুধু একটা খবর চাই, ডিউক-পিন্টু ভাল আছে কিনা।' নীলিমা দেবী চোখে মুখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারলাম না যে, আকাশ পরিস্কার, সমুদ্র শান্ত, ওরা ভাল আছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। ফটোগ্রাফার গুরুচরণ তখন ক্যামেরা নিয়ে মেঝেতে থ হয়ে বসে আছে।

পিনাকীর ছোট ভাই পার্থ খবর দিয়ে গেল—মা, মামা এসেছেন।

বোনকে দেখে—'কীরে ওরকম করছিস কেন? পিন্টুরা ভাল আছে। মিছিমিছি মন খারাপ করিসনি! মনে নেই তোর—আমি যখন বিলেত গিয়েছিলুম, মা তাই নিয়ে কত কাণ্ড করেছিলেন? খাওয়া দাওয়া

ছেড়েছিলেন।' দাদা চন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কথায় বোন নীলিমা দেবী আশ্বস্ত হলেন না।

শুক্লা, পার্থ, মাতবর—সকলেই মুখ ভারী করে দাঁড়িয়ে। চন্দ্রনাথবাবু আবার শুরু করলেন, ওরা ঠিক পৌঁছে যাবে। ডিউক পিনু এখন অনেক জোরে দাঁড় বেয়ে ও আন্দমান অভিমুখী স্রোতে পড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এমন জায়গায় আছে যে আন্দামানে খবর যাচ্ছে না, কলকাতায়ও খবর আসছে না। ওরা ভালই আছে।

শুক্লা মা'র চোখ মুছিয়ে দিল। পার্থকে দাদার কথা জিজ্ঞাসা করতেই অন্যদিকে চলে গেল। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পিনুর মা বললেন, ওরা পৌঁছে যাবে ঠিক। কিন্তু একটা খবর দিন, কেমন আছে। স্বামী, আর. এন চ্যাটার্জির কথা জানালেন, উনি অফিসে একটুও কাজ করতে পারছেন না।

নেমে আসছিলাম সিঁড়ি দিয়ে। মাতবর এগিয়ে এসে বলে গেল, আপনারা তো আগে খোবোর পান। আমি সোব সময় বাড়ি থাকি। ফোন কোরবেন।

ওর চোখেও জল। তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে বলল, পিনু দাদাবাবু, ডিউকসাব ঠিক চলে যাবেন, ঠিক যাবেন। দুজনের গায়ে খুব জোর আছে।

সন্ধ্যায় অফিসে ফিরে রাত দশটা পর্যন্ত আবার অপেক্ষা, পোর্ট ওয়ারলেসে যদি কোন খবর আসে! হিসাব করে দেখলাম, ওরা এখন দিনে অন্ততঃ পনের মাইল যাচ্ছে। তাহলে দুশ' মাইলের বেশি দূরে চলে গিয়েছে 'কানোজি আংরে'। এই অবস্থায় ওদের ওয়ারলেসের খবর কিছুতেই কলকাতায় আসতে পারে না।

ঠিক এক সপ্তাহ আগে এই দিনটির কথা মনে পড়ল। ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে কত হাসি-ঠাট্টা করেছি। সেদিনই ওরা দাড়ি কাটা বন্ধ করেছিল সময়ের অভাবে। এখন সময় আরও কম। দুজনেরই

দাড়ি নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। ওরা এখন নৌকোয় স্নান করছে, খবর শুনছে রেড়িওতে, শুনছে যে, আমরা ওদের জন্য কত উৎকণ্ঠিত! শুনছে নির্বাচনের ফলাফল। কিন্তু পিনাকী আজ কি গান গাইছে—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" বা "আকাশ ভরা সূর্য তারা?" নাকি "চল্‌রে চল্‌রে চল্?"

নানারকম চিন্তা নিয়ে পিনাকীর মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী লিখছিলাম। হঠাৎ পাশের টেবিলে টেলিফোন বেজে উঠল। মিহিরদা বললেন, আগে কথা দিন খবরটা কাগজে বের হবে না, তাহলে বলব। কাগজে বের করা যাবে না, অথচ খবর, এবং অভিযানেরই—এ কেমন কথা? প্রশ্ন জাগল—তবুও তাঁকে গ্যারাণ্টি দিলাম। খবর লেখা যাবে না অথচ আমরা অনেক খবর অনেক সময় জানি, এবং মন্ত্রী থেকে সরকারী আমলারা তা সরবরাহ করে বলেন 'অফ দ্য রেকর্ড'। এ ক্ষেত্রেও তাই করতে হল।

বললেন, কাল সকাল সাড়ে ছটায় দমদম এয়ারপোর্টে আসুন। এয়ারফোর্সের প্লেন ওদের সার্চ করতে যাবে।

—আমিও যেতে চাই ওই প্লেনে।

—চেষ্টা করব। তবে এয়ারফোর্সের অনুমতি সাপেক্ষ।

সংযুক্ত সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষ ও বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরীকে ব্যাপারটা জানাতে তাঁরা বললেন, যে ভাবে পারো ওই প্লেনে যাবে, বিস্তারিত খবর চাই।

রাত্রে বাড়ি ফিরে পরদিনের সকালের চিন্তায় মগ্ন। সারা রাত ঘুম হল না। শুধু একটি প্রশ্ন তোলপাড় করছে—ওরা ভাল আছে তো?

'আংরে'র খোঁজে ফৌজি বিমান

আজ ১২ই ফেব্রুয়ারী। যাদবপুর থেকে দমদম পর্যন্ত সারা রাস্তায় ঘন কুয়াশা। গাড়িটা কিছুতেই দ্রুত এগোতে পারছিল না। যাই হোক ছ'টার মধ্যে পৌঁছলাম এয়ারপোর্ট কণ্ট্রোলরুমে এয়ারফোর্সের অফিসে। নৌ ও বিমানবাহিনীর বড় বড় অফিসাররা এসেছেন। মিহিরদার সঙ্গেও দেখা হল। শুনলাম—সিভিলিয়ান অর্থাৎ আমরা ওই বিমানে যেতে পারব না। অনুমতি পাওয়া যায়নি। সারা রানওয়ে জুড়ে ঘন কুয়াশা। সাড়ে ছটায় বিমানবাহিনীর সুপার কনস্টেলেশান বিমান ছাড়ল না। সকলেই ফিরে চলে গেলেন। জানিয়ে গেলেন সংশ্লিষ্ট অফিসারদের; খবর পাওয়া গেলেই যেন জানান হয়।

আজকের আনন্দবাজার দেখেই মিহিরদা ভীষণ চটেছেন আমার উপর। গতকাল বিকালে পিনাকীর মা'র সাক্ষাৎকার আর সেই সঙ্গে কান্নার ছবিই তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ। 'এইসব মেলোড্রামা করে লাভ কি?' আমি কোনো উত্তর দেই নি। বললেন, এরপর কাউকে কোন খবর দেব না। আমি বুঝলাম—এটাই স্বাভাবিক। অপ্রিয় সত্য কেউ পছন্দ করেন না। তাছাড়া সাংবাদিকদের পেশাটাই 'থ্যাংকলেস্ জব'। ভবঘুরে জীবন আপনজনে পছন্দ করেন না, বাইরেও সব সময় সত্য বলার জো নেই। ভাল কাজ করলে, প্রশংসা করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আমাদের প্রতি খুশি হন; আবার প্রকৃত সমালোচনা করলে আমাদের পিতৃদত্ত প্রাণটুকু কেড়ে নিতেও কসুর করেন না (এ কাজে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী সম্ভবতঃ এখনকার রাজনীতিবিদরা)।

মিহিরদাও এয়ারপোর্ট ছেড়ে চলে গেলেন। রইলাম শুধু একা আমি। বাইরে ঘন কুয়াশা। কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,

কুয়াশা না কাটা পর্যন্ত কোন বিমান যেন কেউ না ছাড়ে। অন্যান্য বিমান বন্দরেও খবর পাঠানো হয়েছে, কলকাতায় এখন কোন প্লেন নামতে পারবে না। আমি একবার এয়ারফোর্সের কন্ট্রোলরুম, আর একবার সিভিল অ্যাভিয়েশনের কন্ট্রোলে পায়চারি করে বেড়াচ্ছি।

হঠাৎ এয়ারফোর্সের একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কোন সাংবাদিক আছেন কি ?

এগিয়ে গেলাম আমি—আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এসেছি।

এবাব তিনি বিশুদ্ধ বাংলায় শুরু করলেন—আজকের সকালে আপনার কাগজ পড়লাম। জাহাজে সার্চ, প্লেনে সার্চ, ওয়্যারলেসে খবর—এত সব ব্যবস্থা থাকলে আর অ্যাডভেঞ্চার কি হল মশাই! ওরা গিয়েছিল কেন ? ফিরলে বলবেন, মায়ের কোলে বসে যেন দুধু ভাত খায়!

—দোষ তো ওদের নয়। ওরা দুজন এসবের জন্য দায়ী নয়।

—তাহলে অভিভাবকরা বা যাঁরা অভিযানের ব্যবস্থা করেছেন তারাই। হরলিকস-টরলিকস পাঠিয়েছেন ওদের বাড়ি থেকে ? দিন—নৌকোয় পৌঁছে দিয়ে আসব।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ হ্যাঁচকা টান দিলেন হাতে। 'যেতে চান চলুন, আমরাও একটা অ্যাডভেঞ্চার করে আসি। দেখবেন, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই অ্যাডভেঞ্চারময়। জীবন কত তুচ্ছ!'

'চলুন', বলে এগিয়ে গেলাম।

—মা, বাবা, বউ কাঁদবে না তো মরলে ?

—আগে মরি তারপর ওসব।

—সকালে খেয়েছেন কিছু ?

—ব্রেকফাস্ট······।

—দ্যাটস্ অল। বেশি খেলে বমি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ফিরব কিন্তু বিকালে।

সম্ভব হলে প্লেনে কিছু খেয়ে নেবেন। আমরা যা খাই, সেই সব। বাইরে তখন কুয়াশা কেটেছে সামান্য। তবুও রাণওয়েতে দাঁড়ানো কাছের প্লেনগুলোও দেখা যাচ্ছে না। ওই অফিসারের সঙ্গে রাণওয়ে দিয়ে হেঁটে প্লেনে গিয়ে বসলাম। যাওয়ার আগে এয়ারফোর্স কণ্ট্রোলে নির্দেশ দিলেন, অন্য অফিসাররা পনের মিনিটের মধ্যে যেন প্লেনে চলে যান। আর একটু পরিষ্কার হলেই আমরা ফ্লাই করব।

প্লেনের ভিতরে ঢুকে বুকটা ঢুরু ঢুরু করছিল। কি জানি কোন বিপদ ঘটে যদি! পৃথিবীর কেউ জানবে না। একেবারে গোপন অভিসার এটি। কোথাও কোন প্রমাণ থাকছে না যে, আমি ওই প্লেনে। প্লেনে চড়ার আগে স্কোয়াড্রন লীডার বলেছিলেন, সশরীরে ফিরে তুমি কাগজে লিখতে পারবে না—সার্চের সময় প্লেনে ছিলে। তবে ছমাস পরে কেউ জানলে ক্ষতি হবে না। হ্যাঁ, তোমাকে সঙ্গে নিলাম কেন জানো? আজকের কাগজে পিনাকীর মা'র উৎকণ্ঠা যাতে ভবিষ্যতে আর কোন মা'র মনে সংক্রামিত না হয়, তাই। উপরন্তু আন্দামান অভিযানের সঙ্গে তোমাদের গ্রুপের, আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড বিস্তারিত লিখছে বলে। যাক ওসব কথা। গত আট বছর আকাশে অ্যাডভেঞ্চার করে বেড়াচ্ছি। বাষট্টিতে চীন-ভারত সংঘর্ষে তেমন ভাল কাজ দেখাতে পারিনি। কিন্তু পঁয়ষট্টিতে কতগুলো পাকিস্থানী প্লেন ঘায়েল করেছি, সে হিসাব নেই। বার পাঁচেক তো নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি। তৃতীয়বারের অ্যাকসিডেন্টটা ছিল মারাত্মক। পাকিস্তানী প্লেনের তাড়া, নিচ থেকে ওদের অ্যান্টিএয়ার ক্র্যাফটের মুহুর্মুহু আক্রমণ—দ্রুত ফিরতে গিয়ে কি কারণে জানিনা ডানায় আগুন ধরে গেল। প্লেনে ছিলাম চারজন। দু জন মারা গেল পুড়ে, আমি আর রেডিও অফিসার বেঁচে গেলাম। রক্তে তখন নেশা। তারপরও দুবার গেলাম। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে মাকে বলেছিলাম ব্যাপারটা। আমি পায়েস ভীষণ ভালবাসি। মা খুশি হয়ে পায়েস রান্না করলেন।

খাওয়ার টেবিলে বললেন, প্রতিমুহূর্তেই বিপদ তোদের কাজে; তবুও সাবধানে থাকিস। তবে মরার আগে শত্রুকে মারবি। না হলে তোকে হারিয়ে কী বলে শান্তি পাবার চেষ্টা করবো—নিশ্চয়ই আমার ছেলে কাপুরুষ বলে নয়!

একালের একজন বাঙালী তরুণের মুখের কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিলাম। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গ পাল্টালাম।—সার্চ করতে হেলিকপ্টার নিলেন না কেন? তাহলে তো ওদের কাছাকাছি পৌছোন যেত!

স্কোয়াড্রন লীডার কণ্ট্রোলকে জিজ্ঞাসা করলেন আবহাওয়া কেমন? তখন সাড়ে সাতটা। অন্য অফিসাররা এসেছেন। রেডিও অফিসার, মেকানিক এবং অন্যরা। সকলের বিমান বাহিনীর পোশাক। শুধু আমি সিভিলিয়ান। কোট-প্যাণ্ট।

—হেলিকপ্টার অতদূর গিয়ে সার্চ করতে পারবে না। যেতে আসতেই ওর তেল ফুরিয়ে যাবে। সার্চ করলেও বড় জোর এক ঘণ্টা। তার বেশি হেলিকপ্টারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কানপুর থেকে আমরা এসেছি এই 'সুপার কনি' নিয়ে।

প্লেনের ইঞ্জিন তখন স্টার্ট নিয়েছে। রেডিও অফিসার বসলেন। স্কোয়াড্রন লীডারের নির্দেশে—ঠিক তাঁর পিছনের আসনে বসলাম আমি। ওদের একজন এসে কোমরে টাইট করে বেল্ট বেঁধে দিলেন। পাশে একটি প্যাকেট রাখলেন। বমির জন্য যেন ওটা ব্যবহার করি। প্লেন টেক-অফ করবে,—এমনি সময়ে কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে আবার নির্দেশ এল—আবহাওয়া আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার যাত্রা বাতিল। ইঞ্জিন থেমে গেল। সকলে নামলাম। ক্যাপ্টেন বললেন, খুব তাড়াতাড়ি গ্রীণ সিগন্যাল পাওয়া যাবে না। কয়েকঘণ্টা দেরী হতে পারে। এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

ঘণ্টা দুয়েক বাইরে কাটিয়ে আবার প্লেনে চড়লাম। দশটায় প্লেন

আকাশে উড়ল। চারশ' মাইল বেগে এয়ার ফোর্সের 'সুপার কনি' বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটে চলল। আমি জানালার ধারে বসে নিচের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। কুড়ি মিনিটের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের আকাশে পৌঁছলাম। প্লেন দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেল। এতক্ষণ ছিলাম দু হাজার ফুট উঁচুতে—এত নেমে গেলাম যে প্লেন থেকে সমুদ্র মাত্র পাঁচ শ' ফুট নিচে।

ম্যাপ দেখে 'কানোজি আংরে'র সম্ভাব্য অবস্থিতি অনুমান করে পাঁচশ' মাইল এলাকাকে এয়ার পকেট ধরে বৃত্তাকারে ঘোরা শুরু হল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ বৃত্ত ছোট হতে থাকল। তারপর আরও ছোট। সব শেষেও যখন 'কানোজি আংরে'র খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন আবার বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র গিয়ে অনুরূপ অনুসন্ধান। বিমান বাহিনী সর্বত্রই এইভাবে অনুসন্ধান চালায়।

সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের বুকে তন্ন তন্ন করে ওদের খোঁজা হল। প্রবল ঝড়ে পড়ে নৌকো বা জাহাজ যেমন আছড়ে পড়ে, প্লেনের মধ্যেও আমার তেমনই মনে হচ্ছিল, কষে বেল্ট বাঁধা থাকলেও। একবার সামান্য বমিও হল। সম্ভবত পেটে কিছু ছিল না, তাই অল্পেই ব্যাপারটি শেষ হয়। ঘুড়ির মত প্লেনও ঘন ঘন ছোঁ মারছিল, গোঁত্তা খাচ্ছিল।

রেডিও অফিসার ঘন ঘন ওয়ারলেস পাঠাচ্ছিলেন সমুদ্রের বুকে। দু-একটি জাহাজ দেখে—ডিউক-পিনাকীর খবর জানো? জানো, 'কানোজি আংরে' কোথায়? প্রতিবারই উত্তর—না।

ওদিকে দমদমের কণ্ট্রোল টাওয়ার বলছে—হ্যালো 'সুপার কনি' কোনও খেবর পেলে? স্কোয়াড্রন লীডারের উত্তর—নো, নো, নো। নট ইয়েট্।

এলোপাথাড়ি ওঠা নামায় আমার মাথা ধরে গিয়েছিল। প্লেনে বসেই কয়েকটা মিলিটারি ট্যাবলেট খেলাম। তারপর ছ'টা নাগাদ দমদমে

নামলাম ক্লান্ত দেহে। সকলের এক জিজ্ঞাসা, ওদের খবর কী? দেখা হয়েছে?

ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইন্সের কাউন্টারে তখন বসে প্রাক্তন অ্যাথলীট জয়া ভট্টাচার্য। সকাল থেকে সে খুঁজছে আমাকে। আনন্দবাজার থেকে ওর কাছে টেলিফোন আসে; তারপরে একাধিকবার জয়া, মাইক্রোফোনেও আমাকে খুঁজেছে। খুঁজেছে ডিউক-পিনাকীর সর্বশেষ সংবাদ ঘোষণার জন্যও। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে যে খবর পেয়েছিল, সেই অনুযায়ী ঘোষণা করেছে—ওদের এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমার কাছ থেকে খবর নিয়ে ঘোষণা করল—কাল এয়ারফোর্স আবার সার্চ করবে।

বিমান বন্দর ছেড়ে চলে আসার সময় সেই বাঙালী স্কোয়াড্রন লীডার আগামী কালের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমি রাজি হইনি। তিনিও বেশি পীড়াপীড়ি করন নি—সম্ভবত আমার যাওয়াটা বে-আইনী বলে।

সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে এসে আর প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে প্রবেশ করতে পারলাম না। মাইকে তখন নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হচ্ছে। বোর্ডে লেখাও হচ্ছে কারা ক'টি আসন পেল। ঘুরে গিয়ে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটের পথে অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করলাম। ওদিকে ভিড় কিছুটা কম। দরজার মুখে এসে দেখি—ওরই মধ্যে কয়েক শ' তরুণ ও মাঝবয়সী লোক অপেক্ষা করছেন ডিউক-পিনাকীর খবরের জন্য। মাইকে নির্বাচনের ফল ঘোষণা স্থগিত রেখে বার কয়েক ঘোষণা করা হল—আজ সারাদিন চেষ্টা করেও বিমানবাহিনী ওদের খোঁজ পায়নি। কাল আবার সার্চ করা হবে।

ঘরে গিয়ে বসতে ঘন ঘন টেলিফোন। এতক্ষণ অন্যরা সামলাচ্ছিলেন। আমার নাম করে বলেছিলেন, ও সাতটার পর ফিরবে, তখন খোঁজ নেবেন। আমাদের পি, বি, এক্সকে জানিয়ে দিলাম—আপনারাই বলে দিন—পাওয়া যায়নি।

মিহির সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বললেন, সম্ভবত ওরা মোহনা থেকে ১৬০কিলোমিটার দূরে রয়েছে। আজ নৌবাহিনীর জাহাজ আই, এন, এস, 'কুকরি'তে এক্সপ্লোরার্স ক্লাব 'কানোজি আংরে'র জন্ম ব্যাটারি সেট ও অন্যান্য জিনিষ পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে টেলিপ্রিন্টারে পি, টি, আইয়ের ছোট একটি খবর এল—সোমবার (১০. ২. ৬৯.) একটি মালবাহী জাহাজ পোর্টব্লেয়ার থেকে রওনা হয়েছে। মঙ্গলবার তাদের সঙ্গে অভিযাত্রী যুগলের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখা হয়নি। আশংকা, 'কানোজি আংরে' দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি। আজ আর ভোরে বিমানবন্দরে যাই নি। গেলাম দশটা নাগাদ। আজ আবহাওয়া পরিস্কার। সকাল সাড়ে সাতটায় 'সুপার কনি' চলে গিয়েছে সার্চ করতে, খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সার্চ চলবে।

এয়ারফোর্স কণ্ট্রোল জানাল, বেলা দেড়টা নাগাদ কানপুর থেকে আর একটি প্লেন আসছে। তারাও সার্চ করতে যাবে। সম্ভবতঃ কম্যাণ্ডার রথীন দাশ তাদের সঙ্গী হবেন। দুটো নাগাদ কম্যাণ্ডার দাশ সেই প্লেনে চড়লেন। সঙ্গে তাঁর নিজস্ব ম্যাপ ও দূরবীণ।

কণ্ট্রোল টাওয়ারে বসে সারাদিন অপেক্ষা করলাম। আমাদের পাঠানো খবরের উত্তর, দুটি বিমান থেকে প্রতিবারই নেতিবাচক। পিনাকীর বন্ধুরাও এসে ভিড় করেছেন বিমানবন্দরে।

চারটেয় ফিরল 'সুপার কনি' ছটায় কম্যাণ্ডার দাশের বিমান। সদাহাস্যময় লোকটিকে দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম দুপুরে। কিন্তু সুখবর দিতে পারলেন না বিকালেও। তবে তিনি চিন্তিত নন। বললেন, সম্ভবত আমরা ভুল জায়গায় সার্চ করছি। কাল স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হবে। জানালেন, বঙ্গোপসাগরের আবহাওয়া ভাল, চিন্তার কোন কারণ নেই।

—কাল কি আবার সার্চ করবেন?

—হ্যাঁ, কালও ছুটো প্লেন যাবে। খুব আশা করছি, কাল ওদের খুঁজে পাবোই।

আমি তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। তবে খবর লিখলাম, তাঁর কথা উদ্ধৃত করে 'পিনাকীদের খুঁজে পাবই'।

ডিউক-পিনাকী ভেসে যায়নি

আজ ১৪ই ফেব্রুয়ারী। আবার দমদম। আবার কণ্ট্রোল টাওয়ার। প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ। 'ইয়েস অর নো।' ছুটোর একটি আজ জানতেই হবে। 'সুপার কনি'র পাইলট তাঁর এক সহকর্মীকে ওই কথা বলে গিয়েছেন।

দশ, এগার, বারো; তারপর একটা বাজলো। কোনও খবর নেই,—কোনও প্লেন থেকে। বাজলো ছুটো। ছুটো এক, ছুটো ছুই, ছুটো তিন। টাওয়ারের ঘড়ি এগিয়ে চলেছে। ছুটো চার, ছুটো পাঁচ, ছুটো ছয়, ছুটো সাত, ছুটো আট।......হ্যালো দমদম, হিয়ার ইজ 'কানোজি আংরে'। বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে একটি প্লেন কথা বলছে কণ্টোল টাওয়ারের সঙ্গে। 'ওদের দেখতে পাচ্ছি। আমরা সমুদ্র থেকে ৫০০ ফুট উপরে। কাছে যাচ্ছি এবার। হ্যাঁ, ওরা ভালই আছে।' তারপর ঘন ঘন বার্তা আদান প্রদান।

দমদমের লাউন্জে অপেক্ষমান সব যাত্রী খবর পেলেন মাইক্রোফোনে। আকাশবাণী বিশেষ বুলেটিন প্রচার করল। বলা বাহুল্য, কম্যাণ্ডার দাশের প্লেনে বেতার তরঙ্গে ছুটো সাতে হঠাৎ সংকেতধ্বনি বেজে

ওঠে—'আর—আর—আর—আর……' অর্থাৎ 'আমরা ভালো আছি, আমরা ভালো আছি।'

বিমান বন্দরে সকলের চোখে মুখে খুশির আনন্দ বয়ে গেল। চারটে নাগাদ দুটো প্লেনই ফিরে এল। সবচেয়ে খুশি মনে হল কম্যাণ্ডার দাশকে। তিনিই সকলের উৎকণ্ঠায় ছেদ টেনেছেন।

অফিসে ফিরে দেখি সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। খবর পৌঁছে দেওয়া হল পিনাকীদের বাড়িতে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী। কলকাতার প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ওদের খুঁজে পাওয়ার খবর। গতরাত্রে আমি যে খবরটি লিখে এসেছিলাম, আজ তা দুই অভিযাত্রীর ডবল কলম ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল।

শিরোনাম—'আমরা ভাল আছি'—ডিউক, পিনাকী ভেসে যায়নি।

তারপর:

এ-ক'দিনের সংবাদ তরঙ্গে নিখোঁজ হলেও ডিউক-পিনাকী সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে যায় নি। ওরা ভালই আছে। ছইহীন নৌকোয় ঘুমুচ্ছে, খাচ্ছে, দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যপথে—আন্দামানের দিকে। সাক্ষী—চন্দ্র-সূর্য-তারকারাজি এবং সমুদ্রের অসংখ্য জীব। ওরাই এখন 'কানোজি আংরে'র প্রহরী। ডিউক-পিনাকীর নিত্যসঙ্গী।

বুধ, বৃহস্পতিবারের মত শুক্রবারও (১৪ই ফেব্রুয়ারি) দুটো ফৌজি বিমান ওদেরই খোঁজে দিগন্তহীন বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিচ্ছিল। বেলা দুটো সাতে একটি বিমানের বেতার তরঙ্গে হঠাৎ সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো—'আর—আর—আর—আর……'—'আমরা ভালো আছি, আমরা ভালো আছি।' ওই সংবাদ পেয়ে বিমানটি ছোঁ মেরে নিচে নেমে গেল। দেখল, মোচার খোলার মত ভাসছে 'কানোজি আংরে'। যেন একটি বিন্দু। সমুদ্র শান্ত, স্থির। তরঙ্গ নেই, বিপরীত স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ডিউক ও পিনাকী মন্থর

গতিতে এগিয়ে চলেছে। 'কানোজি আংরে'কে দেখামাত্র প্লেন গোঁত্তা খেয়ে নিচে নামলো, আরও নিচে। 'কানোজি আংরে' থেকে মাত্র ২০০ ফুট উপরে। বিমানের আরোহীরা দেখলেন, নৌকোর মাস্তুলের উপরে বেলুন উড়ছে। বেলুনে এরিয়েল লাগানো। ওই তো ডিউক ও পিনাকীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওদের গায়ে ট্র্যাক স্যুট। প্যাকেট বিমান থেকে লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার রথীন দাশই টেলিস্কোপে প্রথম ওদের দেখলেন। নৌকোর উপর দুজনই তখন হাত তুলে নাচানাচি করছে। কয়েকটি ড্রাম ভাসছিল। একটু পরেই মনে হল কেউ কেউ সাঁতার কাটছে। ও হো! ওগুলো শুশুক।

প্রায় এক সপ্তাহ পর 'কানোজি আংরে'র সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হল। নির্বাচনের দামামার মধ্যেও শুনেছি অসংখ্য লোকের মুখে এক প্রশ্ন: ডিউক-পিনাকীর খবর কী? এদিন প্যাকেট বিমানের সঙ্গে একটি 'সুপার কনস্টেলেশনও গিয়েছিল।' তাঁরাও আন্দামান অভিযাত্রী যুগলকে দেখেছেন। বিমান থেকে পাইটল জাহাজে খবর পাঠানো হয়। হারবার মাস্টার ক্যাপ্টেন পাভরি ওই জাহাজকে 'কানোজি আংরে'র সঙ্গে যোগাযোগের নির্দেশ দেন। উভয়ের ব্যবধান তখন পঞ্চাশ মাইল। কয়েকঘণ্টার মধ্যে ওরা ডিউক-পিনাকীর কাছে চলে গেল। কাছে গিয়ে স্পীড বোট পাঠায় ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দেয়। ওরা ভালো আছে, মনে খুশির ছটা। আন্দামান অভিযাত্রীরা এখন কলকাতা থেকে ১৯০ মাইল দূরে। ওরা এগিয়ে চলেছে। শুক্রবার সকালে গলুইয়ে দাগ পড়েছে চোদ্দটি।

বিমান থেকে লেঃ কঃ দাশ অভিযাত্রীদের কাছে শুভেচ্ছা জানিয়ে একখানি চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা পাউডারের টিনের মধ্যে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। নৌকোর কাছেই টিনটি পড়ে (ওরা অবশ্য টিনের খোঁজ পায়নি)। বিমান থেকে তখন নৌকোর দূরত্ব মাত্র ২০০ ফুট। টেলিস্কোপে দেখা যাচ্ছে ওরা কি যেন বলছে। কিন্তু

বিমানের শব্দে তার কিছুই শোনা যাচ্ছে না। প্রায় এক ঘণ্টা এই বিমানটি ওদের ঘিরে টহল দেয়। ডিউক-পিনাকীর অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হল—ওরা অনেকদিন পর আপনজনের দেখা পেয়েছে। বিমানটি ফিরে আসার সময় ওরা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানিয়েছে।

প্যাকেট বিমানের স্কোয়াড্রন লীডার পি ফিলিপ ও ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট এ, কে তলোয়ার খান দমদমে ফিরে জানান, বেলা বারোটা নাগাদ তাঁরা দমদম ত্যাগ করেন ও দুটোর একটু পরেই ওদের খুঁজে পাওয়া যায়। বুধ ও বৃহস্পতিবার অভিযাত্রীদের সন্ধান না পাওয়া সম্পর্কে বললেন, আমরা ওদের খুঁজতে প্রথম দুদিন প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে চলে গিয়েছিলাম। ওরা এত কাছে রয়েছে বুঝতেই পারিনি।

দুটো দশ নাগাদ বিমান থেকে ওয়ারলেসে দমদমে খবর এলে মুহূর্ত মধ্যে তা রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। খবর চলে যায় পিনাকীর বাড়ি, খবরের কাগজের অফিসে, আকাশবাণীতে।

আকাশবাণীর শুভ সংবাদ প্রচারের পরও আমাদের অফিসে ঘন ঘন টেলিফোন—ওরা সত্যিই ভালো আছে? তখন কি করছিল? কথা বলছে? ইত্যাদি। সর্বত্র তখন খুশির বন্যা। পিন্টুর মা একটু আগেও কাঁদছিলেন। অন্যরাও অধীর উৎকণ্ঠায়। সাতদিন পর সব উৎকণ্ঠা কেটে গেল। এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেন খুব খুশি। বললেন, ওয়ারলেস ঠিকই আছে; তবে ওদের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। কয়েকঘণ্টা চেষ্টার পর পিনাকীর বাড়ির টেলিফোন লাইন পেলাম। 'এতক্ষণ সকলে খবর নিচ্ছিলেন'—জানাল পিন্টুর বোন শুক্লা। 'মা আশ্বস্ত, দাদা ভাল আছে শুনে।'

কয়েকদিন ধরে ডিউকের মামা ক্যাপ্টেন ডি. বি. ব্রাগাঙ্কা চিন্তিত ছিলেন। দিল্লি থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, তিনি খবর শুনে খুশি। ডিউকের বাবা মা এখন কানাডায়; তাঁরাও এতক্ষণ খবর পেয়েছেন যে, জর্জি ভালোই আছে।

পিনাকীকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে

সকালের কাগজগুলো পড়ে আবাল বৃদ্ধর মধ্যে স্বস্তি দেখা গেল। বিকালে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবে গিয়ে, 'কানোজি আংরে' এগিয়ে চলছে জেনে আরও ভাল লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই চেয়ারম্যান শ্রীসেন অপ্রত্যাশিত খবরটি দিলেন, এশিয়ার এই প্রথম নৌ-অভিযানের (দাঁড়টানা) একমাত্র বাঙালী সদস্য পিনাকী রঞ্জন চ্যাটার্জিকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। পিনাকীর বাবা-মা ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে চান। অবশ্য এজন্য অভিযান বাতিল হবে না। পিনাকী ফিরে এলে ওর বদলে অন্যজন যাবে। বললেন, অভিযানের জন্য পিনাকীর নির্বাচনের পর থেকেই ওর বাবা রথীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি ও মা নিলীমা দেবী নানা বিপদের কথা ভেবে ছেলের নাম বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন। ক্লাবের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও বলা হয়। অথচ পিনাকী সোৎসাহে অভিযানে যাওয়ার জন্য আবেদন করে, নির্বাচন লাভের পর ক্লাবের নিয়মানুযায়ী স্বেচ্ছায় সে 'ইন্‌ডেমনিটি বণ্ডে' স্বাক্ষরও দেয়।

পিনাকীর বাবা-মা'র দিক থেকে চাপ আসা সত্ত্বেও ক্লাব এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়নি। কারণ পিনাকীর বয়স একুশের উর্ধে, তার মতের দামও আছে। ইতিমধ্যে 'কানোজি আংরে' নদী পেরিয়ে সাগরে চলে গিয়েছে। এদিকে ওই পরিবার থেকে প্রবল চাপও আসতে থাকে। ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিরও চেষ্টা হয়।

এখন তাঁরা ক্লাবকে এক চরমপত্রে জানিয়েছেন, অভিযাত্রী-নৌকোর সঙ্গে রোজ খবরাখবরের ব্যবস্থা করতে হবে, ওরা ঠিক কবে-আন্দামান পৌঁছুবে—নইলে অভিযান প্রত্যাহার করুন। এশিয়ায় এ-ধরণের অভিযান এই প্রথম এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় বিপদসংকুলও। তাই

উদ্যোক্তারা সাধ্যানুযায়ী ওদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু একথা ঠিক, ওরা পিকনিক করতে যাচ্ছে না।

আর অনুসরণকারী জাহাজ নিয়ে তো যে কেউ আন্দামান যেতে পারে। তাতে কৃতিত্ব কোথায়!

ওয়ারলেস সম্পর্কে শ্রীসেন বলেছেন, আমরা এমন সেট সংগ্রহ করেছিলাম, যার ওজন বেশি নয় অথচ কাজ চলবে। সি ১১—আর ২১০ সেটও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাতে ৫০০ পাউণ্ড ওজনের ব্যাটারী সেট চাই। এতে অসুবিধাও অনেক। 'কানোজি আংরে'তে এঞ্জিন নেই। সুতরাং চার্জ করা হবে কি করে! ছোট নৌকোয় পানীয় জল, খাবার, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এরই ওজন এক টনের বেশি। অবশ্য উল্লিখিত ওয়ারলেস সেট দিলে হাজার মাইল দূর থেকেও ওদের খবর পাওয়া যেত। কিন্তু শুরুতেই বিপদের সম্ভাবনা ছিল বেশি ওজনের জন্য। যে কোন মুহূর্তে নৌকো ডুবে যাওয়ার আশংকা ছিল।

আমরা হাল্কা দুটি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফ সেট দিয়েছি। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ওরই মারফৎ ৪০ ও ১৬০ মাইল দূরে খবরও পাঠিয়েছে। শুরুতেও বলেছিলাম, চলতি পথের জাহাজগুলোর সঙ্গেই ওরা যোগাযোগ করতে পারবে। তারাই রিলে করে খবর পাঠাবে কলকাতায়।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাব সম্পর্কে বিরোধিতার উল্লেখ করে শ্রীসেন বলেন, অসংখ্য উদাহরণ আছে। অবশ্য পুত্রের কথা ভেবে এ-করা স্বাভাবিক। তবুও আমরা মনে করি, ভারতীয়দের এই ধরণের দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এসেছে। কিন্তু পিনাকীর বাবা-মার দিক থেকে যে ভাবে চাপ আসছে তাতে আর ওকে অভিযান চালাতে দেওয়া উচিত নয়। ক্লাবেরও দুর্নাম হচ্ছে। আমরাও তাই নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। আমরা স্থির করেছি, পিনাকীর বাবা ও মাকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমাদেরই খরচে পিনাকীর কাছে পৌঁছে

দেব। পিনাকীও যাতে নিরাপদে কলকাতায় আসতে পারে তার ব্যবস্থাও করেছি।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, পিনাকী ফিরে এলে তার জায়গায় আর একজন যাবে এবং সেও প্রস্তুত। আরও জানাচ্ছি, গত ক'দিন জাহাজ ও বিমানে ওদের যে অনুসন্ধান করা হয়, তা শ্রী ও শ্রীমতী চ্যাটার্জির অনুরোধেই। অনুসন্ধান কাজের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী এবং কম্যাণ্ডার আর পি খান্নাকে ধন্যবাদ। পরিশেষে বলছি, আমরা পিনাকীকে টিম থেকে বাতিল করবো না, অভিযানও প্রত্যাহৃত হবে না।

'কন-টিকি'ও একশ দিন নিখোঁজ ছিল

শ্রীসেনের ওই বিবৃতির পাশেই 'একশ দিন 'কন্-টিকি'রও খবর পাওয়া যায়নি' শীর্ষক নিবন্ধ লিখলাম:

সমুদ্র বা পর্বত যে কোন অভিযানে প্রতিমুহূর্তে বিপদ, জীবন সংশয়। তবুও অজানাকে জানার, দুর্জয়কে জয়ের দুর্বার বাসনা অতীতে ছিল, একালেও আছে। অ্যাডভেঞ্চার তো সেখানেই, দুঃসাহসের প্রমাণও তখনই—যখন নানা বাধা, বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লক্ষ্যে পৌছানো যায়। অবশ্য আন্দামান অভিযাত্রী, ডিউক-পিনাকীর কোন বিপদ ঘটেনি। ডাঙা থেকে শুধু কয়েকদিন ওদের খবর পাচ্ছিলাম না। ওদের বেতার যন্ত্র ঠিকই ছিল। বিকল হলেই বা ক্ষতি কী? আন্দামান পৌছোনোটাই তো বড় কথা।

ই প্রসঙ্গে 'কন-টিকি' অভিযানের কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৭ সালে ছয়জন 'পাগল' মিলে কাঠের ভেলায় যে সমুদ্র অভিযানে গিয়েছিলেন, সেই অভিযানে আমেরিকার পেরু থেকে পলিনেশিয়ার দ্বীপে দুরন্ত

ছিল ৪,৩৫০ মাইল। আন্দামান অভিযানের মূলেও অনেক পাগল রয়েছেন। এদের মধ্যে বদ্ধ পাগল বোধ হয় মিহির সেন। এই ধরণের পাগলদের কোনো কালে গৃহসুখ সহ্য হয় না। পলিনেশিয়া অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল ওখানকার এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, আন্দামান অভিযানের উদ্যোক্তা এখানকার এক্সপ্লোরার্স ক্লাব।

যে দিগন্তহীন সমুদ্রে মোটর লঞ্চেরও প্রবেশ নিষেধ, সেখানে ছোট একটা ডিঙি নিয়ে যে দুই অভিযাত্রী দিনের পর দিন কাটাচ্ছে তারাও পাগল বৈ নয়। এদের মত 'কন্ টিকি' অভিযাত্রীদের বেতার যোগাযোগও ছিন্ন হয়েছিল। তবে 'কন-টিকি'র মত একেবারে সংযোগহীন নয়। ৮ই ফেব্রুয়ারি ডিউক-পিনাকী সংকেত পাঠাচ্ছিল, কিন্তু ওরই মাঝে একটি জাহাজের শক্তিশালী ওয়ারলেস বার্তা পাঠাতে শুরু করে। 'কন্-টিকি'র ওরা একশ দিন স্থলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেই নি বলা যায়। যাওয়া এক আধবার যোগাযোগ হয়েছে, তাতে সব সৃষ্টিছাড়া খবর। 'কন্-টিকি' অভিযাত্রীদের পক্ষ থেকে বেতার সংকেত পাঠাতেন সাধারণত টরস্টাইন। একদিন শর্ট ওয়েভে লস এঞ্জেলসের এক উটকো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হল। 'কন্-টিকি' অভিযানের আগেই, থর হেইয়ের ডালের সঙ্গীরা বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছিলেন, বাড়ির লোকেরাও মাথা ঘামাতেন না। তবু অভিযানে এসে একদিন বেতার যোগাযোগ যখন হল, তখন 'ভাল আছি' খবরটা দিতে কী! কাঠের ভেলা থেকে খবর পাঠাবার আগে লস এঞ্জেলস থেকে উটকো লোকটা বলা শুরু করল—তার নাম ধাম। বউয়ের নাম, বউটি কোন্ জাতের, কী ভাবে মেয়েটির সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিল ইত্যাদি। সে যোগাযোগও কয়েকদিনের জন্য। একদিন হু হু করে ভেলার বেতার খোপে নোনা জল ঢুকে গেল। বেতার কেন্দ্র তারপর বন্ধ। লস এঞ্জেলসের সেই লোকটা ধরে নেয়—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ওই পাগলগুলো

নিশ্চয়ই সাবাড় হয়ে গিয়েছে। হয়ত এখন সকলেই হাঙরের উদরে। এদিকে ওরা বেতার যন্ত্রটা ধরে ঝাঁকুনি দেয়, এটা ঘোরায়, অমুক স্ক্রুটা এঁটে দেয় ইত্যাদি। একদিন রাত্রে হঠাৎ বোল্‌তার চাকের মত বেতার যন্ত্র ভন্‌ ভন্‌ শব্দ করে উঠল। আর একজনের সঙ্গে যোগাযোগ সেদিন। তার বাড়ি অসলোর কাছাকাছি। 'কন্‌-টিকি' থেকে ওরা ১৩,৯৯৯ কিলো সাইকলসের শর্ট ওয়েভে যোগাযোগ করতেন। মাঝে মাঝে অভিযাত্রীদের সঙ্গী চন্দনা পাখিটি এরিয়েলের তার কেটে দিত। ব্যস্‌! অমনি উট্‌কো লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ কাট-অফ্‌।

আন্দামান অভিযাত্রীদের এ বিপদ নেই। 'কন-টিকি'র ওদের মতই বেলুনে এরিয়েল টাঙানো। ভাগ্যিস ওদের মত ডিউক-পিনাকী পেটকাটি, চৌরঙ্গী বা মুখপোড়া ঘুড়ি নেয় নি! ঘুড়িতে বাঁধা এরিয়েল উপরে ওঠে বটে, কিন্তু যে কোন সময় চোঁওও করে বঙ্গোপসাগরের জলে ছোঁ মারতে পারে। এরিয়েলে তাহলে শব্দ তরঙ্গের বদলে সমুদ্রের ঢেউ ধরা পড়বে। শুরুতেই 'কন্‌-টিকি'দের হাঙর, সমুদ্রের সাপ আর কদাকার জন্তুগুলো ভয় দেখিয়ে যেত; ওরা আন্দামান অভিযাত্রীদের মুখোমুখী এখনও হয়নি। ওদের ভেলার গায়ে আটলান্টিকের প্রবল ঢেউ আর কল্লোল, বুক কাঁপিয়ে দিত। এদের বঙ্গোপসাগর শান্ত। দিনে দুবার আকাশবাণী বিশেষ আবহ-বার্তাও জানাচ্ছে। এদের ষাটদিনের খাদ্য মজুত আছে, ওদের আহার্য ছিল সমুদ্রের মাছ; ঝলসে বা পুড়িয়ে খেত দলনেতা হেইয়ের ডাল এবং সতীর্থ নুট, বেঙট, এরিক, টরস্টাইন ও হেরমান।

আজই আবার আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে 'অভিযান' শিরোনামায় লেখা হল :

"লক্ষ লক্ষ মানুষের অধীর উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা আপাতত শেষ। সপ্তাহব্যাপী উৎকণ্ঠা-অন্তে প্রত্যাশিত সংবাদ মিলিয়াছে,—লেঃ জর্জ ডিউক আর

পিনাকী চট্টোপাধ্যায় কুশলেই আছেন। তাঁহাদের ছোট্ট ডিঙ্গি 'কানোজি আংরে' একটি স্থির প্রতিজ্ঞার মত ভাসমান; অভিযাত্রী দুই তরুণ নাবিক দেহ-মনে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, দাঁড় টানিয়া আপন মনে তাঁহারা লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন। অভীষ্ট উপকূল এখনও অনেক দূরে, কিন্তু প্রত্যয়ে দৃঢ় এই তরুণ যুগলের যে চিত্রটি বিমান এবং নৌবহরের দর্শকেরা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাতে নির্দ্বিধায় আশা করিব—সিদ্ধি নিশ্চিত। এই দেশের প্রতিটি মানুষের শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ ব্যর্থ হইতে পারেনা। ডিউক আর পিনাকীর সংবাদের জন্য যে আকুলতা ঘরে ঘরে দেখা গিয়াছে তাহা তুলনাহীন; ইঁহারা যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন, নিজেদের সন্তান অথবা সহোদর ভাই। আর সব উত্তেজনাপূর্ণ যুগান্তকারী সংবাদের মধ্যেও কেহ তাঁহাদের মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই, থাকিয়া থাকিয়া সেই এক জিজ্ঞাসা—খবর মিলিল? খবর মিলিয়াছে। রুদ্ধশ্বাসে যতি, মুখে মুখে প্রসন্ন হাসি। আমাদের আশা এই হাসি যথাকালে উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পড়িবে, ডিউক আর পিনাকী নির্দিষ্ট সময়ে আন্দামানে তটরেখা স্পর্শ করিবেন, আমরা আরও প্রাণ খোলা হাসিতে মাতিবার সৌভাগ্য লাভ করিব।

একদিকে অসংখ্যের সবিস্ময় সভয় প্রতীক্ষা, অন্যদিকে অভিযাত্রীর নিঃশঙ্ক নিশ্চিত পদক্ষেপ—সব অভিযান উপলক্ষ্যেই এই দৃশ্য দেখা যায়। দর্শকেরা কখনও বিস্ময় বিস্ফারিত নয়ন, কখনও আতঙ্কে কম্পমান,—তাহার মধ্যে আপন সংকল্পে অটল মানুষটি নিঃশব্দে নিজ লক্ষ্যের দিকে আগাইয়া চলেন। ইহার সঙ্গে হাততালির যে সম্পর্ক তাহা অনেকটা কাকতালীয়, কলম্বাস হইতে শুরু করিয়া 'অ্যাপলো-৮' এর অভিযাত্রীদল—অনায়াসে তাঁহারা অন্যতর কোন জীবন বাছিয়া লইতে পারিতেন, মসৃণ কোন পথের পথিক সাজিতে পারিতেন; তবু ক্ষুরধারসম সূক্ষ্ম পথটিই বাছিয়া লইলেন কেন,—সে একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের

মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে 'অ্যাডভেঞ্চার' এই শব্দটির অর্থ। যাহা গতানুগতিক, যাহা সহজসাধ্য তাহা পাশ কাটাইয়া যাহা দুঃসাধ্য, যাহা দুর্জয় তাহা জয় করিবার বাসনা যাঁহাকে পাইয়া বসিল সে-ই তো প্রকৃত অভিযাত্রী। তাঁহার কাছে মৃত্যুভয় তুচ্ছ, নিরাপত্তা-চিন্তা গৌণ, লাভ লোকসানের চিন্তা অবান্তর। যদি তাহা না হইত তবে মানুষ এভারেস্ট জয় করিতে পারিত না, মেরু অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত, আফ্রিকার সঠিক মানচিত্র অঙ্কিত হইত না, মানুষ চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীর দিকে তাকাইবার কথা ভাবিত না। আদ্যিকালের ভেলায় চড়িয়া কনটিকি অভিযান সম্পন্ন করিয়াছেন হেইয়েরদাল এবং তাঁহার সঙ্গীরা, হারমানবুল কার্যত একাকী জয় করিয়াছেন নাঙ্গা পর্বত। এ-জাতীয় কাহিনী আরও অসংখ্য ছড়াইয়া আছে। প্রতি উপাখ্যানেরই সারকথা এক,—ভয় ভাবনা আর সকলের, অভিযাত্রীর একমাত্র ভাবনা লক্ষ্যভেদ, তিনি পাখিটির চক্ষু ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না। ডিউক আর পিনাকীও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নন।

'কানোজি আংরে'র লক্ষ্য আন্দামান। দূরত্বও মন্দ নহে, প্রায় হাজার মাইল। উত্তাল সমুদ্র, মোচার খোলের মত সামান্য একটি ডিঙ্গি; ডাঙার মানুষের কাছে তো বটেই, জলের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহাদের কাছেও এই অভিযান নিশ্চয় তুচ্ছ ব্যাপার নহে। সত্য, ইহার আগে জলেও মানুষ নানা অসম্ভব কাণ্ড করিয়াছে। এই সেদিন ব্রিটেনের প্রবীণ অভিযাত্রী স্যার ফ্রান্সিস চিসেস্টার ডিঙ্গি চড়িয়াই দুই শ' পঁচাত্তর দিনে বিশ্ব পরিক্রমা করিয়াছেন। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন, পথে ডাঙা স্পর্শ করিয়াছেন মাত্র একবার। বলা নিষ্প্রয়োজন, চিসেস্টার এই অসাধ্য সাধন ব্রতে প্রথম মানুষ নহেন। তাঁহার আগে এবং পরে কমপক্ষে আরও দুই ডজন মানুষ এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডকে সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মাত্র কয়দিন আগে এক মার্কিণ তরুণ সাড়ে পাঁচ বছর ডিঙ্গি লইয়া সাত সমুদ্র ঘুরিয়া আবার নিজের

বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডিঙ্গিযোগে বিশ্ব পরিক্রমায় এই মুহূর্তে নাকি কয়েক কুড়ি মানুষ চেষ্টা করিতেছেন। তা সত্ত্বেও সগর্বে বলিব, ডিউক আর পিনাকীর সংকল্প অনন্য। কারণ তাঁহারা আমাদের ঘরের ছেলে, এবং একথা স্বীকারে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্য দেশে এ জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার একটি অবলুপ্ত প্রায় কাহিনী। হালে যে সব তরুণ পাহাড়ে, পর্বতে, সমুদ্রে, মরুভূমিতে সেই লুপ্ত আত্মাকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পরম গৌরবের ধন। পিনাকী আর ডিউক সেই নাতিবৃহৎ রত্নসভায় অন্যতম ঐশ্বর্য বলিয়াই বিবেচিত হইবেন।

এই অভিযানের উদ্যোক্তা যাঁহারা, তাঁহাদের গৌরবও সামান্য নহে। জয়-পরাজয়, সাফল্য ব্যর্থতাই এ-জাতীয় উদ্যোগে একমাত্র বিচার্য নয়, অস্ত্রের মত আদি এবং মধ্য পর্বে প্রস্তুতি হইতে শুরু করিয়া নানাবিধ কর্তব্যের কথাও বিবেচ্য। এক্সপ্লোরার্স ক্লাব এবং তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমিহির সেন এ জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। তিনি নিজে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী, সপ্ত-সিন্ধু জয়ের বিজয়মাল্য তাঁহার গলায়। আন্দামান অভিযানে নিজে তিনি যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু অনুমান করিতে অসুবিধা নাই, মনে মনে তিনিও 'কানোজি আংরে'র একজন যাত্রী, আমাদের বিশ্বাস, এই অভিযানের সাফল্য সংবাদ যেদিন মিলিবে, দেশবাসী আনন্দে সেদিন গৌরবের এক ভাগ উদ্যোক্তাদের হাতেও তুলিয়া দিবেন। অভিযান মুহূর্তে অভিযাত্রীরা নিঃসঙ্গ বটে, কিন্তু তাহার আগে, পরে এবং মধ্যে অন্যদের ভূমিকাও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। অভিযানে অভিযাত্রীদের ব্যক্তিগত সাহসের কথা প্রশ্নাতীত, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এ-জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় ও সাহসের প্রয়োজনও কম নহে; এমন কি সাহস চাই সাহসিকতা পূর্ণ এই অভিযান-কাহিনী শুনিতেও।"

মিহির সেনের বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আমাদের দফতরে ঘন ঘন টেলিফোন। পিনাকীকে যেন ফিরিয়ে আনা না হয়। যদি তিনি চলে আসেন, তাহলে আমরা যাবো। কিছুতেই অভিযান বাতিল হতে দেব না।

দেবব্রত চৌধুরী নামে সাতাশ বছরের এক তরুণ জানিয়ে গেল, আমি হিন্দ মোটরে কাজ করি। স্বর্গত গৌরাঙ্গ চৌধুরী আমার দাদা।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী ১৯৮৫ সালে পর্বত অভিযানে গিয়ে চিরতরে নিখোঁজ হন। দেবব্রত বলে গেল 'আমি প্রস্তুত।'

সন্ধ্যায় যোগাযোগ করলাম পিনাকীর বাবা-মার সঙ্গে। পিনাকীর বাবা রথীন চ্যাটার্জি বললেন, মিহির সেনের বিবৃতি প্রসঙ্গে; শ্রীসেন অভিযানের একাধিক ত্রুটি ঢাকার জন্য 'পুত্রের প্রতি পিতামাতার অপত্য স্নেহের' কথা বলছেন। পিনাকীকে প্রত্যাহার করা সম্পর্কে আমরা শ্রীসেনকে কোন চিঠি দিইনি। পিনুর মা ১৯শে জানুয়ারি নানা প্রশ্নের উত্তর চেয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন মাত্র—যার উত্তর আজও পাইনি। চ্যাটার্জি পরিবার থেকে কোনরকম চাপ সৃষ্টি করা হয়নি বলে পিনাকীর বাবা জানান।

তবে তিনি বলেন, অভিযাত্রীদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া হয়নি। এবং একথা ঠিক, ওদের তাড়াহুড়ো করেই পাঠানো হয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে ওরা যে যোগাযোগ করবে সে ব্যবস্থাও নেই—এ প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। 'কানোজি আংরে'র ট্রান্সমিটার কাজ করেনি, ফলে সকলে উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

এছাড়া শুরুতে শ্রীসেন বলেছিলেন, রোজই ওদের এগিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু তেমন কোনও ব্যবস্থা হয়নি। পরিশেষে শ্রীচ্যাটার্জি জানান, ১৪ই ফেব্রুয়ারি টেলিফোনে নানা কথা আলোচনার

পর শ্রীসেনই বলেছিলেন, পিনাকীকে প্রত্যাহার করা হতে পারে। উত্তরে আমি তখনই জানাই, পিনাকীকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নই ওঠে না।

অভিযান নিয়ে এই বিতণ্ডা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। বিশেষতঃ অকূল সমুদ্রে ছোট একটা ডিঙি নিয়ে ওরা যখন থল জলের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামে নিরত, সেই মুহূর্তে তাদের অলক্ষ্যে ডাঙায় বসে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দিয়ে অভিযানকে কলুষিত করা কেন? একবার ভাবলাম কারুর বিবৃতি না ছাপাই ভাল। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

আজ ১৭ই ফেব্রুয়ারি। দুপুরে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবে খোঁজ নিতেই কানাডা থেকে ক্লাবের চেয়ারম্যানকে লেখা একটি চিঠির অনুলিপি দেওয়া হল। লিখেছেন ডিউকের মা, বাবা, ভাই ও বোন। তাঁরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ক্লাবকে এইজন্য যে, এশিয়ার এই দুঃসাহসিক অভিযানে জর্জিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বড় ভাল লাগল পিনাকীকে ফিরিয়ে আনার বিতণ্ডার মধ্যে ওই কথা কটি। একবার মনে হল বাঙালী আজ ভীরু, কাপুরুষ। পরক্ষণেই পিনাকীর মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে—স্যাণ্ডহেডসে এপারের শেষ অভিনন্দন জানাবার মুহূর্তটি। না, বাঙালী কাপুরুষ নয়, ভীতু না। পিনাকীই তার প্রমাণ।

এদিন সকাল পৌণে দশটায় মোহনার জাহাজে 'কানোজি আংরে'র খবর ধরা পড়েছে। জানিয়েছে 'আর, আর, আর'। অর্থাৎ 'আমরা ভালো আছি'!

হিসাব মত আজ অভিযানের সপ্তদশ দিবস।

১৮ই ফেব্রুয়ারি। আজও গতকালের মত সুখবর। খবর এসেছে বঙ্গোপসাগর থেকে মোহনায় আসা একটি জাহাজ মারফৎ—ওরা ভাল আছে। বঙ্গোপসাগর শান্ত। বিপরীত মুখী স্রোত থাকলেও 'কানোজি

আংরে'র গতি বেড়েছে। মোহনা থেকে 'আংরে' রয়েছে সত্তর মাইল দূরে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় গিয়েছে দশমাইল।

১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে আবার সেই 'আর, আর, আর' সংকেত। কিন্তু সন্ধ্যায় আই এন এস 'হুগলি' থেকে একটি টেলিফোন এল— 'আংরে'র জরুরী খবর আছে। এক্ষুনি চলে আসুন। দূরভাষে কোনও আভাষ দিলেন না ওঁরা ডিউক-পিনাকী সম্পর্কে।

ওখানে পাইলট জাহাজের এক অফিসারের সঙ্গে দেখা। কিছুক্ষণ আগে তিনি ফিরেছেন। গত সপ্তাহে তিনি স্পীড বোটে করে অভিযাত্রীযুগলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাঁর কাছে ওরা আবার বলে পাঠিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের শুভেচ্ছাই আমাদের আন্দামানে পৌঁছে দেবে। মাঝে মাঝে উড়ুক্কু মাছ দেখছি, শুশুক তো দেখছিই। ওই অফিসার বললেন,—ওদের দেখে মনে হল উভয়ের চোখে মুখে আন্দামান পৌঁছানোর দৃঢ়তা আরও বেড়েছে। 'টিনফুডে' ওরা রপ্ত। বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। দুজনেরই গোঁফ দাঁড়ি বড় হয়েছে। ওরা বলেছে আন্দামান পৌঁছে তবে দাড়ি গোঁফ কাটবে। এখন এসব কাজ করে সময় নষ্ট করতে চায় না। মোহনার পর বিপরীতমুখী স্রোত কয়েকদিন ডিউক-পিনাকীকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। সমুদ্রের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওদের একমাত্র সঙ্গী রেডিও। পিনাকী মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে; ডিউক ইংরাজী গান।

আরও বললেন, ওই অফিসার: 'কানোজি আংরে' কয়েকদিনের মধ্যেই বিপরীত মুখী স্রোত কাটিয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর একটি খবর দিলেন তিনি—গত কয়েকদিন ধরে একটি পাখি সঙ্গী হয়েছে ডিউক-পিনাকীর। সব সময় সে নৌকোয় বসে থাকে। ওরা কিছু ছুঁড়ে দিলে পাখিটি তা খাচ্ছে। রাত্রেও নৌকো ছেড়ে চলে যায় না।

২০শে ফেব্রুয়ারি সকাল ও সন্ধ্যা দুইবারের একবারও মোহনার কোন

জাহাজ 'আংরে'র খবর পায় নি। সম্ভবত দূরে সরে যাচ্ছে নৌকো। তাছাড়া কথা ছিল দূরে গিয়ে রোজ খবর পাঠাতে গেলে গ্যাস বেলুনে এরিয়েল বেঁধে পঁচিশ বা ত্রিশ গজ উঁচু করতে হবে এরিয়েল। তখন বঙ্গোপসাগরের বুকের জাহাজগুলি 'কানোজি আংরে' থেকে পাঠানো বার্তা-সংকেত তাদের ওয়্যারলেসে ধরতে পারবে। ওঁরাই রিলে করে কলকাতায় খবর পাঠাবেন। কিন্তু তাতেও ঝুঁকি কম নয়—রোজ গ্যাস বেলুন তুলে এইভাবে খবর পাঠাতে থাকলে বেলুন যদি আন্দামান পৌঁছোবার আগে ফুরিয়ে যায় এবং পথিমধ্যে যদি কোনো বিপদ ঘটে তখন 'এস ও এস' পাঠাবারও উপায় থাকবে না।

আগেই বলেছিলাম, অভিযান নিয়ে বিতণ্ডার সময়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক চিঠি আসছিল। টেলিফোনেও নানান জনের নানা অভিমত। কিন্তু একটি চিঠি ভরসা দিল। তিনি লিখলেন:

আন্দামান অভিযাত্রী শ্রীপিনাকীর জন্য উদ্বিগ্ন বাপ-মায়ের খবর পড়ে নিজের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট অভিযাত্রী সংঘের দুটি তরুণ—শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রবীর গুপ্ত হেঁটে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও জওহরলাল নেহরু ওদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। ওদের রওনা হওয়ার দিন নিজে উপস্থিত থেকে ডাঃ রায় আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে'। যিনি ওদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছিলেন, সাহস যুগিয়েছিলেন তিনি অভিযাত্রী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমিহির সেন। শ্রীসেন আমাকে বারবার বলেছিলেন, ভয় পাবেন না, ওরা নিশ্চয়ই জয়ী হবে।

ওদের দুজনকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফেরার পর মন ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠেছিল, রাত্রে ঘুম হোত না। সকলের শুভ ইচ্ছাই আমার মনে জোর এনে দিয়েছিল, তাই কেবলই মনে হত—ওরা নিশ্চয়ই জয়ী হবে। একদিন ওরা সত্যিই পৌঁছে গেল গন্তব্যস্থলে। পিনাকীর

মাকেও আমি বলতে চাই যে, ওরা নিশ্চয়ই জয়ী হবে। সারা দেশের মানুষের শুভেচ্ছা ডিউক ও পিনাকীকে জয়যুক্ত করবে!

—অভিযাত্রী অরুণের মা, কলকাতা-২৫

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন দৈনিকে পূর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনে নিহত অমর শহীদদের স্মরণে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরাও ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

কম্যাণ্ডার দাশ আবার কর্ণধার!

আমি লক্ষভ্রষ্ট হইনি। দুপুরে কম্যাণ্ডার দাশের সঙ্গে টেলিফোনে কথার মাঝে হঠাৎ ওঁর স্ত্রী সুনন্দা দেবীর কণ্ঠ 'আপনারা কি আমাকেও চিন্তায় ফেলতে চান?' ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। বললেন, ওঁকে কেন নৌকোয় পাঠান হচ্ছে!

দেরী না করে ফটোগ্রাফার বিশুদাকে (বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত) নিয়ে হাজির হলাম ডায়মণ্ডহারবার রোডে কম্যাণ্ডার দাশের বাড়িতে।

তিনি প্রস্তুত। আজ বিকালে মোহনায় চলে যাচ্ছেন। সেখান থেকে যাবেন জাহাজে চড়ে 'কানোজি আংরে'র উদ্দেশে। মোহনা পর্যন্ত তিনি যেমন নৌকোর কর্ণধার ছিলেন, আবার মাঝদরিয়া থেকে আন্দামান পর্যন্ত তিনি একইভাবে হাল ধরবেন। এক্সপ্লোরার্স ক্লাব শেষ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ সকাল পর্যন্তও সুনন্দা দেবী এবং তাঁর মা জানতেন না যে কম্যাণ্ডার দাশ 'আংরে'র কর্ণধার হতে চলেছেন। ওঁদের ধারণা ছিল, অন্যদিনের মতই তিনি জাহাজে যাচ্ছেন। 'এইভাবেই তো প্রতিবার যান!' দুপুরেই তিনি স্ত্রীকে বলেন, আন্দামান থেকে ফিরে দেখা হবে।

অধিক রাত্রে মোহনা থেকে ওয়ারলেসে খবর এল, শ্রীসেন ও কম্যাণ্ডার দাশ সেখানে পৌঁছেছেন। শ্রীসেন কম্যাণ্ডার দাশকে নৌকোর হালে বসিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

ডিউক-পিনাকীর আন্দামান অভিযানের গতি শ্লথ হওয়ায় এক্সপ্লোরার্স ক্লাব এই সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রীসেনের আশা, রথীন দাশের সহযোগিতায় 'কানোজি আংরে'র গতি দ্রুত হবে। কলকাতা থেকে মোহনা পর্যন্ত তাঁরই নেতৃত্বে নৌকোর গতি দ্রুত ছিল। একদিন সাড়ে চার ঘণ্টায় ষোল মাইলও গিয়েছিল। কিন্তু মোহনায় ওদের দুজনকে ছেড়ে আসার পর গতি কমে যায়। দশ মাইলের বেশি কোনোদিন ওরা এগোতে পারেনি। গত সপ্তাহে বিমান অনুসন্ধানের পর মিহিরদা চিন্তিত ছিলেন। কারণ মার্চের মধ্যে অভিযান শেষ করা দরকার। তারপর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হয়ে উঠবে। ছোট ডিঙির পক্ষে তখন চলা দায় হবে।

গত সপ্তাহে এ সম্পর্কে কম্যাণ্ডার দাশ বলেছিলেন, এখন ওদের রোজ কুড়ি মাইল যাওয়া দরকার। বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধ এসেছিল কম্যাণ্ডার দাশের কাছে—আপনিও অভিযানে থাকুন। কিন্তু নৌকো ছোট। অন্যান্য জিনিসও আছে। ভারী হয়ে যাবে বলেই ওরা দূরপাল্লার ওয়ারলেসও নিতে পারেনি।

এখন রথীনবাবু ডিউক-পিনাকীর সঙ্গী হলে নৌকো থেকে অনেক খাবার ফেলে দিতে হবে—ভারসাম্য রাখার জন্যই। ফেলে দিয়ে যে অল্প খাদ্য থাকবে—তিনজনকে তা ভাগ করে খেতে হবে।

২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি 'কানোজি আংরে'র কোনো খবর পেলাম না। পোর্ট কমিশনার্সের ওয়ারলেস দু দিনই জানাল, মিহির সেন ও কম্যাণ্ডার দাশ পাইলট জাহাজে আছেন। ওঁরা 'কানোজি আংরে'কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি। বিকাল পর্যন্ত 'আংরে' বা কম্যাণ্ডার দাশদের

কোনও খবর এল না। সুনন্দা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল, ডিউক-পিনুকে খুঁজে পাওয়া না গেলে আজ ওঁরা দুজন কলকাতায় ফিরবেন।

পাইলট জাহাজ ওদের খুঁজে পেল না

রাত আটটায় পোর্ট-ওয়ারলেস বলল, 'কম্যাণ্ডার দাশ ও মিহিরবাবু এখন কলকাতার পথে।' বারোটায় ফিরে মিহিরদা জানালেন, 'কানোজি আংরে'-কে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মোহনা থেকে দুই শ' মাইলের মধ্যে ওদের খোঁজা হয়েছিল, পাওয়া যায়নি। সম্ভবত ওরা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। হয়ত 'আংরে'র গতি ত্রিশ মাইল বা তারও বেশি। গত ২০শে ফেব্রুয়ারি ওরা মোহনায় শেষ যে বার্তা পাঠায়—তাতে দেখা গিয়েছে—ডিউক-পিনাকী তাদের বহু অভিলষিত উত্তর-পূর্ব স্রোতে নৌকো ভাসিয়েছে। ওই স্রোত সম্ভবত মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 'আংরে'কে আন্দামানে পৌঁছে দেবে। অনুমান, 'কানোজি আংরে' ও তার দুই নাবিক এখন কলকাতা থেকে প্রায় চারশ' মাইল দূরে।

আজ সোমবার। গত শুক্রবার কম্যাণ্ডার দাশ ও মিহিরদা মোহনায় গিয়েছিলেন। মিহিরদা আরও বললেন, স্থির করেছিলাম, ডিউক পিনাকী কম্যাণ্ডার দাশের সহযোগিতা চাইলে তিনি কর্ণধাররূপে আন্দামান যাবেন। "আমরা চলে যাচ্ছি", 'আংরে' থেকে এই বার্তা থাকা সত্বেও শনিবার (২১. ২. ৬৯) মোহনা থেকে ২০০ মাইল দূরে গিয়ে মিহিরদা ও কম্যাণ্ডার দাশ 'কানোজি আংরে'কে খোঁজেন, যদি দেখা পান—এই আশায়। আরও পঁচিশ ত্রিশ মাইল খুঁজলেন। তবুও দর্শন মেলেনি। এদিকে আকাশবাণীকে বলা ছিল—

২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁরা যেন ডিউক-পিনাকীর জন্য বিশেষ বার্তা প্রচার করেন, তাই শুনে অভিযাত্রীদ্বয় বেলুন উড়িয়ে খবর পাঠাবে। কিন্তু 'আংরে' কোনও খবর দেয়নি। তার আগেই ওরা উত্তর-পূর্ব স্রোতের টানে আন্দামানের দিকে চলে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ওই স্রোতে পড়েই ডিউক জানায়, আমরা সুস্থ আছি, খাদ্য ও পানীয় যথেষ্ট রয়েছে। পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে আবার দেখা হবে। পথে কোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হলে খবর পাঠাবো।

মিহিরদাকে খুব খুশি মনে হল। রাত্রে আরও বললেন, ডিউক এই স্রোতই খুঁজছিল। আমিও ভাবছিলাম কবে এই স্রোত ওরা পাবে।

আমি ওঁকে একটি সুখবর দিলাম, গত কয়েকদিনের আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, অবাক হয়ে যাচ্ছি, ছবিগুলো কোথা থেকে পেলেন !

—মাঝ দরিয়ায় হঠাৎ এক জাহাজের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়। ৩৫ মিলিমিটারের চারটে পুরো রোল পাঠিয়েছে। তবে অধিকাংশই আণ্ডার। যেগুলো ভাল উঠেছে—তাই ছাপা হচ্ছে।

আজ ২৫শে ফেব্রুয়ারি। সমুদ্র অভিযানের ইতিহাস খুঁজতে গেলাম বেলভেডিয়ারে জাতীয় গ্রন্থাগারে, সেখান থেকে জওহরলাল নেহেরু রোডে ইউসিস লাইব্রেরিতে।

ইউসিস জনসংযোগ দফতরের শৈলেশ রায় জানালেন, বই পত্তর তাঁদের কিছু কিছু আছে। তবে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ লাইব্রেরীর মাইক্রো ফিল্ম বিভাগে। পেলামও।

'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'

১৯৬৭ সালের 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার কয়েকটি কপির মাইক্রো ফিল্ম আমার ভীষণ কাজে এল। 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' শিরোনামায় বিস্তর ছবি এবং একজন অভিযাত্রীর লোমহর্ষক সমুদ্র অভিযানের কাহিনী।

নৌকোয় একাকী বিশ্ব পরিক্রমায় রেকর্ড, পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ স্যার ফ্রান্সিস চিসেস্টারের।

চিসেস্টার ইংল্যাণ্ডের প্লিমথ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে অস্ট্রেলিয়া ও সিডনী গিয়েছিলেন ; সেখান থেকে আবার আটলান্টিক পার হয়ে ফিরে আসেন। ২২৬ দিনে তিনি এই পথ পরিক্রমা করেছিলেন।

১৯৬৭ সালের ২৮শে মে যখন তিনি 'জিপসী মথ—৪' নৌকো নিয়ে প্লিমথ ফিরে এলেন, তার আগেই চিসেস্টার ইউরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রে 'ম্যান ইন দ্য নিউজ' হয়ে গিয়েছেন ; চিসেস্টার সংবাদ-শিরোনাম অন্য দেশেও। প্লিমথ পৌঁছে কয়েকশ' সাংবাদিকের সঙ্গে কথা শুরুর আগে বললেন, এতদিন জলে বাস করে আমি কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছি, অনেক কথা এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে। কেউ কিছু মনে করবেন না। চিসেস্টার তার আগে এই অভিযানের সুবাদেই 'স্যার' খেতাব পেয়েছেন।

অদ্ভুত এই মানুষটি। এতদিনের সমুদ্র অভিযানের পরও দেখা গেল বেশ সুস্থই আছেন। শুধু ওজন কমেছিল পঁচিশ পাউণ্ড।

অভিযান সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, বাড়ির কাছে আটলান্টিককে দেখেছিলাম আগেই। কিন্তু ভারত মহাসাগর আর অস্ট্রেলীয় উপকূলকে চিনলাম এবার। মাঝে মাঝে সমুদ্র-ঝড় বড্ড ঝামেলা করতো। ষাট, আশি, একশ মাইল বেগের ঝড়ও বয়ে গিয়েছে 'জিপসী মথ' এর উপর দিয়ে।

একদিন রাত্রের ঘটনা : চিসেস্টার ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় এল। বুঝতে পারেন নি স্বপ্ন না সত্য। সকালে ঘুম ভাঙার পর ঠোঁটে হাত বুলিয়ে দেখেন, খানিকটা কেটে গিয়েছে। নৌকোও কয়েক জায়গায় মেরামত করতে হল।

আরও একদিন এমন 'ট্রপিক্যাল হারিকেন' হল যে, 'লণ্ডন টাইমস' ও 'সাণ্ডে টাইমস' এর সঙ্গে রেডিও টেলিফোনে তিনি কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারলেন না। সারাদিন ও রাত্রে ছয়-সাত ঘণ্টা চেষ্টার পর ডাঙার মানুষদের সঙ্গে (ওই পত্রিকা অফিসে) যোগাযোগ হল রাত ১টা ৪০ মিনিটে। 'লক্ষ লক্ষ পাঠকের অধীর উৎকণ্ঠা মিটবে' জবাব দিলেন চীফ এডিটর। চিসেস্টারের স্ত্রী দুপুর ও সান্ধ্য সংস্করণের 'টাইমস'-এ স্বামীর কোনও খবর না দেখে বার কয়েক টেলিফোন করেছিলেন কাগজের অফিসে। চীফ এডিটর সে খবর জানাতে মাঝ সমুদ্র থেকে বুড়ো লোকটি বললেন, এত রাত্রে ওঁকে জাগিও না। সকালে কাগজ পড়লেই বুঝবে, আমি বেঁচে আছি।

হাজার হাজার মাইলের এই সমুদ্র অভিযানে বুড়োর সঙ্গী ছিল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। যে কোনও সময় সলিল সমাধি ঘটার আশংকা ছিল নৌকোসহ একমাত্র যাত্রীর। তবুও মাঝে মাঝে ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আয় তো দেখি !' বিপরীত ঝড়ে ওঁর নৌকোর পাল দুটো তীর বেগে দিক পরিবর্তন করেছে অসংখ্যবার। বুড়ো হতাশ হন নি। তবে সিডনী পৌঁছে ভেবেছিলেন, 'আর যাব না ; অ্যাডভেঞ্চার এখানেই শেষ হোক।'

কিন্তু খবর কাগজগুলো দেখে ওঁর চক্ষু ছানাবড়া। অস্ট্রেলিয়ার সব কাগজের তিনি হেড লাইন। 'আমি এত বড় বীর ? তা হলে তো আবার নৌকোয় ফিরতে হয় !'

চিসেস্টার আবার যাত্রা শুরু করলেন। পালে হাওয়া লেগে এগিয়ে চলেছে নৌকো। ডেকের উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। একদিন ঝড়

থামার পর ঘণ্টা দুয়েক লাগলো পাম্প করে নৌকো জলশূন্য করতে। সেদিন চিসেস্টার বারে বারে ঈশ্বরের নাম জপেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে ইনি 'সিঙ্গল হ্যাণ্ডেড বাই নেচার' বলে খ্যাত। কোনোদিন জীবনের মায়া ছিল না। সাতান্ন বছরের মাথায় এক ডাক্তার তাঁকে বলেছিলেন, তোমার ফুসফুসে ক্যানসার হয়েছে, বদলে নাও। প্রবীণ চিসেস্টার তখন 'ফো!' বলে হেসে উড়িয়ে দেন। ১৯৬০ এর কথা। আটলান্টিক-নৌকো রেসে চিসেস্টারকে দেখে সকলে অবাক। তাদের ধারণা, বুড়োটা শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহার করবেই। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষে দেখা গেল বিজয়ী হয়েছেন ফ্রান্সিস চিসেস্টার। প্লিমথ বন্দরে ফেরার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, প্রশ্ন ছিল সাংবাদিকদেরও—এই অভিযানে স্মরণীয় ঘটনা কি?

—বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম এতদিন। নৌকোর পাল দুটোর মাস্তুল উঁচু ছিল ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি করে। রেডিও ডিরেকশন ফাইণ্ডার, ইকো সাউণ্ডার, স্পীড গজ ও দূরত্ব মাপার যন্ত্র ছিল সঙ্গে। পাল ও হাল দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত।

ফ্রান্সিস চিসেস্টারের ওই অভিযানের উদ্যোক্তা ছিল তিনটি সংস্থা এবং ওঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়। নৌকো, সরঞ্জাম ও খাবারের জন্য খরচ পড়েছিল ৯২ হাজার ডলার। 'টাইমস' ও 'সাণ্ডে টাইমস' পত্রিকা 'এক্সক্লুসিভ' খবর বাবদ দেয় ২৫ হাজার ডলার।

২৬শে ফেব্রুয়ারি। আজ বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেলাম 'কানোজি আংরে' নিয়ে ডিউক-পিনাকী যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় ২০শে মার্চের মধ্যে ওরা আন্দামান পৌঁছে যাবে। 'কানোজি আংরে' থেকে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব এখন প্রায় চারশ মাইল। সম্ভবত ওরা মোহনা থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকেই যাচ্ছে।

রাত্রে খবর এল নৌবাহিনীর সূত্রে,—নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল এ, কে, চ্যাটার্জিও জানতে চান অভিযাত্রীদ্বয় এখন ঠিক কোথায়? তিনি একটি ফৌজি জাহাজকে আন্দামানের পথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জাহাজখানি গত রাত্রে বিশাখাপত্তনম্ বন্দর থেকে রওনা হয়ে গিয়েছে। আজ সকালে সে মোহনা থেকে ১৩১ মাইল দূরে ছিল। আজ রাত্রেই তারা ডিউক-পিনাকীর দেখা না পেলেও, অন্ততঃ বেতার যোগাযোগ করতে পারবে বলে মনে হয়।

এদিকে বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আকাশবাণীর কলকাতা ও দিল্লী কেন্দ্র থেকে আজ প্রতিটি সংবাদ বুলেটিনের বিশেষ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে ডিউক-পিনাকীর উদ্দেশে : রাত্রে মাস্তুলের আলো জ্বালিয়ে রাখবে এবং দিনে হলুদ পতাকা ওড়াবে। নৌবাহিনীর জাহাজে খাদ্য ও পানীয় পাঠানো হয়েছে; প্রয়োজন হলে ওইগুলো নেবে, কিছু বলার থাকলেও তা জানিও ওদের মারফৎ।

রাত বারোটা অবধি কোনো খবর এল না সেই ফৌজি জাহাজ থেকে। মোহনা, দিল্লী বা কলকাতায় কোনো খবর নেই। না 'কানোজি আংরে'র, না জাহাজের। পোর্টব্লেয়ারের নৌবাহিনীর অফিস এবং আমাদের সংবাদদাতা সমর সোমের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাঁরাও 'কানোজি আংরে'র কিনারা করতে পারলেন না।

আবার রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। আবার নানা চিন্তা। 'কানোজি' কোথায়? কোনরকম বিপদ ঘটেনি তো? না, সে পথ হারিয়ে আন্দামানের লক্ষ্য ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে।

সেনাবাহিনীর অফিসার আমাকে বললেন, যদি ওরা স্রোতের টানে বা ঝড়ে পড়ে ৯০ ডিগ্রি অক্ষরেখা ও ১৫ ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখা থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকে এবং জাহাজ যদি তদনুযায়ী খোঁজ না করে তাহলে 'কানোজি আংরে' ও তার দুই নাবিক ভারত মহাসাগরের অকূল দরিয়ায় চলে যাবে। আর কোনোদিন ওদের পক্ষে আন্দামান পৌঁছান

সম্ভব হবে না। মহাকাল ওদের হাতছানি দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

শেষ কথাগুলি আমার পছন্দ হয়নি। আবার নিজের বিশ্বাসে—'ওরা ভাল আছে, ঠিক পথে চলছে'—এই ধারণাতে অটল থাকতেও পারছিলাম না। সমুদ্র তথা প্রকৃতির অসীম ক্ষমতার উপর কে সব সময় অন্ধ বিশ্বাস রাখতে পারে!

২৭শে ফেব্রুয়ারিও কোনো খবর নেই। আবার উৎকণ্ঠায় অধীর বিভিন্ন মহল। প্রথমবার 'নিখোঁজের' (?) পর থেকে আজ পর্যন্ত কত চিঠি যে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। চিঠিগুলির অধিকাংশই ডিউক-পিনাকীর নামে। তাদের কাছে যেন ওইগুলি অবিলম্বে পৌঁছে দেওয়া হয়। খামের মধ্যে কেউ পাঠিয়েছেন বিভিন্ন মন্দিরের প্রসাদ, প্রসাদী ফুল। ওদের মঙ্গল কামনা করে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী মন্দিরে পুজো দিয়েছেন, মসজিদে খোদাতাল্লার কাছে আকুতি জানিয়েছেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছেন। কিছু চিঠি পিনাকীর মা ও বাবাকে সান্ত্বনা জানিয়ে, কিছু কিছু চিঠি এক্সপ্লোরার্স ক্লাব, এই দুঃসাহসিক অভিযানের আয়োজন করেছেন বলে, ওই সংস্থার চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে।

'কানোজি' আবার নিখোঁজ?

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি। সারাদিন সকলের এক জিজ্ঞাসা—'কানোজি কোথায়?' আনন্দবাজার পত্রিকার উর্ধতন মহল থেকে শুরু করে যে ভক্তিপদ সরকার আমাদের জন্য শুধু সময়মত চা ও জল দিয়েই সব পাঠ চুকিয়ে দেয়, যে কোন কথায় রা কাড়ে না—সেও প্রশ্ন করছে—কেন ওদের দুজনকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন! মা-বাবার মনের খবর তো জানেন না!

সন্ধ্যা পর্যন্ত একবারের জন্যও অফিসের বাইরে যাইনি। আবার ট্রাংক কল বুক করলাম পোর্টব্লেয়ারে আমাদের সংবাদদাতার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য।

সাতটায় হঠাৎ ডাক পড়ল সংযুক্ত সম্পাদকের ঘরে। বার্তা সম্পাদক চীৎকার করে টেলিফোনে কথা বলছেন, কী মনে হচ্ছে আপনার, ওরা বেঁচে আছে তো! নেভির জাহাজ ওদের দেখা পেয়েছে?

টেলিফোন রেখে তিনি বললেন, যাক যোগাযোগ হয়েছে, ওরা আন্দামানের কাছাকাছি।

সমর সোম পোর্টব্লেয়ার থেকে জানান, 'কানোজি আংরে' এদিন দূর সমুদ্র থেকে বিকাল চারটায় 'এস ও এস' পাঠিয়েছে। 'এম ভি নিকোবার' জাহাজ বার্তাটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর পোর্টব্লেয়ারের একটি ফৌজি জাহাজে পৌঁছে দেয়। ওই বার্তা অনুসারে জানা যায়—'কানোজি আংরে' তখন ১৬ ডিগ্রি (উত্তর) অক্ষরেখা ও ৯২'২০ ডিগ্রি (পূর্ব) দ্রাঘিমা রেখায়।

কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার যেতে আন্দামানের উত্তরাংশে প্রথম দ্বীপ থেকে 'আংরে'র দূরত্ব ২০০ মাইল (পোর্টব্লেয়ার থেকে এই দ্বীপের দূরত্ব ১৮০ মাইল)। অর্থাৎ পোর্টব্লেয়ার ও 'কানোজি আংরে'র ব্যবধান ৩৮০ মাইল।

'এম ভি নিকোবার' একথাও জানিয়েছে যে, সে 'আংরে'র কাছে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে।

রাত দশটায় আবার পোর্টব্লেয়ার থেকে সমর সোমের টেলিফোন: রাত ৭টা ৫০ মিনিটে 'নিকোবার' জাহাজ পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখে 'কানোজি আংরে' সেখানে নেই। ৮টা ৩৫ মিনিটে 'নিকোবার' ওয়ারলেসে আবার জানাল, ওদের দেখতে পাচ্ছি না।

সে ফৌজি বিমান পাঠাবার অনুরোধ করেছে।

এদিকে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল চ্যাটার্জি সন্ধানী ডেস্ট্রয়ারটিকে

ও 'নিকোবার' জাহাজকে উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্থানে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই ডেস্ট্রয়ারটি গত তিনদিন ধরে ওদের খুঁজছিল। নৌবাহিনীর আরও একটি জাহাজ ওই অঞ্চলে আছে। সেও 'আংরে'র দিকে এগিয়ে চলেছে।

আজই সকাল দশটায় ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ 'ওশান প্রিন্সেস' ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। সে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের কিছু দরকার আছে? উত্তরে পিনাকীরা কি বলেছে জানা যায় নি। দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটে আরও একটি জাহাজ ওদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। সেও কোনো উত্তর না পেয়ে চলে যায়। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, ওদের বেতার যন্ত্রটি ইতিমধ্যে হয়ত বিকল হয়ে পড়েছে। অধিকরাত্রে 'নিকোবার' শেষ খবরে বলেছে, সমুদ্র শান্ত, ঝড় নেই।

আর একটি খবর পেলাম কলকাতায় শিপিং কর্পোরেশনের অফিস থেকে। ওই সংস্থার একটি জাহাজের অন্যতম অফিসার পি, কে, সেন জানান, আজ দুপুরে ওদের নৌকো থেকে আমাদের জাহাজ 'নিকোবারে'র দূরত্ব ছিল ৫০ মাইল। রাত আটটার মধ্যে ওরা 'আংরে'র কাছে পৌছে যাবে। শ্রীসেন বললেন, 'এস ও এস' পাওয়া যায় বেলা সাড়ে তিনটেয়।

বিশেষজ্ঞরা জানান, 'এস ও এস' মানেই বিপদ নয়। সমুদ্রে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে এরকম সংকেত দেওয়া হয়। উপরন্তু ওরা তো 'এস ও এস' এবং 'ওকে' ছাড়া আর কিছু পাঠাতে পারছে না।

রাত একটায় যোগাযোগ হল লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার রথীন দাশের সঙ্গে। বললেন, 'কানোজি আংরে'র খবরের জন্য তিনিও উদ্‌গ্রীব। 'নিকোবারে'র সংবাদ 'সমুদ্র শান্ত, ঝড় নেই'—কথাগুলো ভালো। রাত্রিবেলা ওই রকম একটি ছোট নৌকোকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

খবর মিলেছে ঃ আন্দামান আর ১১৫ মাইল

আজ শনিবার। ১লা মার্চ। সকালেই 'কানোজি আংরে'র দেখা মিলেছে। ৯টা ৫৫ মিনিটে একটি ফৌজি বিমান 'আংরে'কে দেখতে পায়।

পোর্টব্লেয়ার থেকে সমর সোম জানালেন, ডিউক-পিনাকীর খবর ভালো। ওরা দ্রুত পোর্টব্লেয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে। আজ দুপুর পর্যন্ত কোকোদ্বীপ থেকে ওদের দূরত্ব ছিল ১১৫ মাইল, আর পোর্ট-ব্লেয়ার থেকে ২৭০ মাইল। ৯ই মার্চের মধ্যে ওরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এম ভি 'নিকোবারে'র অনুরোধ অনুযায়ী আজ সকালে একটি ফৌজি বিমান ওদের সন্ধানে যায় এবং দশটার কিছু আগে দেখতে পায়, মোচার খোলার মত 'কানোজি আংরে' এগিয়ে চলেছে। সমুদ্রের কাছাকাছি নেমে আরও ভাল করে লক্ষ্য করে—ওরা দাঁড় বাইছে।

ফৌজি জাহাজ 'রণজিৎ' বিমান থেকে খবর পেয়ে 'আংরে'র দিকে এগিয়ে যায়। 'রণজিৎ' ওদের দেখে বেলা তিনটেয়। তারপর স্পীড বোটে করে কয়েকজন অফিসার অভিযাত্রীদের কাছে যায় ও কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা খোঁজ নেয়। ওরা বেশ দুর্বল। মাঝে অসুখে ভুগেছে। 'রনজিৎ' থেকে এক সময় চিকিৎসকরা প্রস্তাব দেন, শরীরে না কুলোলে তোমরা অভিযান এখানেই শেষ করতে পারো।

ডিউক-পিনাকী ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। পিনাকী জানিয়েছে, আর তো সামান্য পথ। এখন অভিযান প্রত্যাহারের কোন মানে হয় না। আরও বলেছে, দাঁড় বেয়েই আন্দামানে যাবো, দাঁড় বাইতে বাইতে যদি মরেও যাই সেও ভালো।

'আই এন এস রণজিৎ' আবার খবর দিল। দুর্বল হলেও মনে ওরা দড়। এবং বেশ খুশি খুশি লাগছে দুজনকে।

১৯শে ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে যোগাযোগ হল। 'আংরে' এখন ১৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ৯২'৪৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায়।

এর আগে এম ভি 'নিকোবার' শুক্রবার সারারাত 'আংরে'কে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সাক্ষাৎ পায়নি। সকালে 'স্টেট অফ গুজরাট' জাহাজও অনুসন্ধান করে। ডিউক-পিনাকীর সন্ধানে আজ সকালে কলকাতা থেকে একটি ফৌজি বিমান পোর্টব্লেয়ারের দরিয়ার দিকে যাওয়ার কথা ছিল। ওই খবরের পর তার যাত্রা বাতিল করা হয়েছে।

এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান শ্রীসেন রাত্রে বললেন, 'আংরে'র গতি এখন দ্রুত। তিনি আন্দামান প্রশাসনকে পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি জায়গা থেকে 'আংরে'র জন্য অন্ততঃ রাত্রের দিকে প্রহরী রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ পোর্টব্লেয়ারের কাছে সমুদ্রে প্রবাল দ্বীপ ও ডুবন্ত পাহাড় রয়েছে। ওদের সঙ্গে 'আংরে'র ধাক্কা লাগলে 'আংরে' টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

অভিযান কাকে বলে

২রা মার্চ। সকালে কাগজ খুলতেই দুটো চিঠি চোখে পড়ল। শিরোনাম—'অভিযানের মানে'।

"অভিযান মানেই প্রতিপদে বিপদ। সব অভিযান একবারে সফল হতেই হবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই। তেনজিং, হিলারির আগে কত অসমসাহসী এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন, ব্যর্থ হয়ে ফিরেও এসেছেন, কিন্তু আবার পরের বছরই দেখা গিয়েছে —দলে দলে এভারেস্ট অভিযানে চলেছেন তরুণরা, প্রৌঢ়ও কেউ

কেউ। আনন্দবাজারের উদ্যোগে পর্বত অভিযাত্রী সংঘ প্রথমবার মানা অভিযানে ব্যর্থ হন। কিন্তু তাই বলে কি ওঁরা কম সাহসী ছিলেন? বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটাই দুঃসাহসিকতা!
ডিউক-পিনাকীর সম্পর্কে নানা আলোচনা শুনেছি। মোহনার পর বিপরীতমুখী স্রোতের জন্য কিছুদিন ওঁরা বেশিদূর এগোতে পারেন নি। ওঁদের আন্দামান পৌছানো সম্পর্কে অনেকে সন্দিগ্ধ ছিলেন। ধরা যাক, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জন্য এবারের অভিযান মাঝপথে প্রত্যাহৃত হল। তাতে ডিউক-পিনাকীর বীরত্ব কি কমবে? জানিনা এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের এই অভিযানে কত যুবক নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম অভিযাত্রীরূপে এঁরা কি ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন না? ঈশ্বর না করুন, কিছুদিন আগে নৌকোয় আটলান্টিক অতিক্রমের সময় দুই সাংবাদিকের মত ডিউক-পিনাকীও সুনীল সাগরে যদি চিরকালের মত হারিয়ে যান! তাহলে কি ভবিষ্যতে কোনও অভিযান হবে না? গঙ্গোত্রী অভিযানের নিহত নায়ক গৌরাঙ্গ চৌধুরীর সহোদরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দাদার অন্তিম দশার কথা জেনেও তিনি আবার অগ্রজের পথে পা বাড়াতে চান—এর পরও কি বলব: বাংলার তারুণ্যে ভাঁটা পড়েছে?"

—রঞ্জন রায়, টালিগঞ্জ, কলকাতা।

দ্বিতীয় চিঠি:
"ডিউক-পিনাকীর নৌকোয় আন্দামান অভিযান প্রসঙ্গে ১৭৯২ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে পালতোলা জাহাজে এক মহিলার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ অভিযানের কথা মনে পড়ছে। ওই অভিযানে পুরুষদের সঙ্গে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন মেরী অ্যান টালবট। মেরী লিখছেন: সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠেছে। দলনেতা বললেন—সব ফেলে দাও, জাহাজ হালকা কর। জলের পাত্র, বিস্কুটের টিন এবং অন্যান্য অত্যাবশক অনেক জিনিষ সমুদ্রে ফেলে দিলাম। সমস্যা শুরু হল তারপর। পরদিন

থেকেই বিস্কুটে ঘাটতি। আটদিন পানীয় জল ছিল না। কিন্তু সহায় ছিলেন ঈশ্বর। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছিল। যতটা সম্ভব সেই জল সংগ্রহ করলাম।...... একদিন আমাদের বড় মাস্তুলটা ভেঙে সমুদ্রে পড়লো। চারজন অভিযাত্রী সমুদ্রে নেমে ওটা উদ্ধার করতে গেলেন। ওঁরা আর ফেরেননি।

আমিও অক্ষত ছিলাম না। কাঁধের হাড় ভেঙে যায়, একটি পাঁজরাও। সান ডোমিংগো বন্দর থেকে যখন নতুন দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, তখন আরও বিপদ। একদিন ঝড়ের পর খোঁজ নিচ্ছি—কে কেমন আছেন। এক সহযাত্রী জানাল—আমাদের সকলের অভিভাবক আজ চলে গেলেন ; ক্যাপ্টেন বাউয়েন আর নেই। তারপরও আমাদের অভিযান স্থগিত রাখিনি। মেয়ে বলে আমাকে পরের দ্বীপে নামিয়ে দেওয়ার কথা ওঠে। আমি কিন্তু শেষ অবধিই গিয়েছিলেন।

একেই বলে অভিযান।"

—মিনতি চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা-১৬।

রবিবার। অফিসে লোকজন সাধারণত কম। অন্যদিনের মত বাইরের লোকের আনাগোনা কম থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো নাগাদ অফিসে প্রবেশ মুখেই দেখি কয়েক শ' লোক। ছাত্র-ছাত্রী, যুবক প্রৌঢ়ের ভিড়। সকলেরই জিজ্ঞাসা ঃ ডিউক-পিনাকীর খবর কি। ওরা এখন কতদূরে। কবে আন্দামানে পৌছবে, কলকাতায় ফিরবে কবে ইত্যাদি।

রিসেপসনিষ্ট আমাকে দেখিয়ে বললেন ওঁদের, ইনি সব খবর জানেন। সেদিন তখনও 'কানোজি আংরে' সম্পর্কে নতুন কোনও খবর আমার কাছে ছিল না। ওঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে রিপোর্টার্স রুমে ঢুকতেই শুনি একটি টেলিফোন বাজছে। রিসিভার তুলতে—'পি পি সন্তোষ কুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী অর চিরঞ্জীব। ট্রাংক কল ফ্রম পোর্টব্লেয়ার।'

সমর সোম পোর্টব্লেয়ার থেকে বলছেন—'কানোজি আংরে'র গতি দেখে মনে হচ্ছে—এই সপ্তাহেই লেঃ জর্জ ডিউক ও পিনাকী চ্যাটার্জি পোর্টব্লেয়ারে পৌছবে, খুব বেশি হলেও আর ছয়দিন লাগতে পারে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় 'আংরে' আন্দামানের দিকে প্রায় চল্লিশ মাইল এগিয়েছে। গতরাত্রে পিনাকীর ভাল ঘুম হয়েছে। কয়েকদিন যাবৎ ওর ডান হাতে যে ব্যথা ছিল, আজ সকালে সে সেই ব্যথা-মুক্ত হয়েছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি মোহনার কাছ থেকে উভয়ে প্রিয়জনের কাছে ওপার থেকে শেষ বার্তা পাঠিয়েছিল, এপারের দিকে এসে প্রথম বার্তা পাঠাল আজ।

নৌবাহিনীর ডেস্ট্রয়ারটি দূর থেকে ওদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। আন্দামানের পথে অন্যান্য জাহাজও 'আংরে'র খবর নিচ্ছে। এখনও ডিউক-পিনাকীর প্রধান সহায় সমুদ্র-স্রোত। দ্রুত ওরা আন্দামানের উপকূল-স্রোতে ঢুকে পড়বে। এই স্রোতই ছয়দিনের মধ্যে ওদের গন্তব্য স্থলে পৌছে দেবে।

ডেস্ট্রয়ার থেকে স্পীড বোটে কয়েকজন অফিসার ওদের কুশলবার্তা জানতে গেলে পিনাকী ওর মা-বাবার জন্য বার্তা পাঠিয়েছে। ডিউক কাগজে লিখে অফিসারদের কাছে যে বার্তাটি দেয়, ডেস্ট্রয়ারের ওয়ারলেস মারফৎ তা পোর্টব্লেয়ারে পাঠান হয়। সেখান থেকে ওটি বোম্বাইয়ে ওর ভাবী বধু কোমল সচদেবকে পাঠানো হয়েছে। উভয়েই স্থলের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের একটি পৃথক বার্তায় বলেছে: আপনাদের শুভেচ্ছাই আমাদের সাফল্যের পাথেয়।

গেটে অপেক্ষমান জনতাকে বললাম খবরটা। তাঁরা 'ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যার পর কলকাতায় হঠাৎ দেখা হল, আন্দামানের চীফ কমিশনার শ্রীবুটালিয়ার সঙ্গে। বললেন, ডিউক-পিনাকীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মিহিরদার সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, 'কানোজি আংরে' ৫ই মার্চ কোকো চ্যানেলে প্রবেশ করবে। ওই দিন কিংবা পরদিন ওরা ল্যাণ্ডফল দ্বীপে জাতীয় পতাকা ও এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করবে। আন্দামান প্রশাসন ওখান থেকে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে পোর্টব্লেয়ারের দিকে।

৩রা মার্চ। ডিউক-পিনাকী সম্পর্কে আজ প্রথম খবর পাঠালেন, নয়াদিল্লী থেকে আনন্দবাজারের বিশেষ সংবাদদাতা খগেন দে সরকার। খগেনদা 'কানোজি আংরে'র খবর পেয়েছেন নৌবাহিনীর সদর দফতরের সূত্রে। 'আই এন এস রণজিৎ' গভীর দরিয়া থেকে আজ সকাল সাড়ে ন'টায় দিল্লীকে জানায়, অভিযাত্রীদ্বয় প্রায় দশদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগেছে। দুর্বল হয়ে পড়লেও ওদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি।

সকাল দশটা নাগাদ ওরা কোকোদ্বীপ থেকে ৮০ মাইল দূরে ছিল।

রাত্রে সমর সোম টেলেক্সে খবর পাঠালেন—'আংরে' কোকো দ্বীপ থেকে সত্তর মাইল দূরে। বুধবার (৫.৩.৬৯) ভোরে কোকো চ্যানেলে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভিযাত্রীদ্বয় নৌবাহিনীর পথ নির্দেশ অনুযায়ী তারপর 'নাও' নিয়ে যাবে উত্তর হয়ে পূব দিকে।

৪ঠা মার্চ। আজ অধিকাংশের প্রশ্ন: কবে কখন ওরা আন্দামানের মাটি স্পর্শ করবে। আন্দামানের উত্তরাংশের প্রথম দ্বীপ থেকে 'আংরে' আর কতদূরে? আমিও সারাদিন ওই একটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য বার পাঁচেক পোর্টব্লেয়ারে টেলিফোন করলাম। টেলেক্সে যোগাযোগ করলাম। ওই প্রান্ত থেকে আমাদের সংবাদদাতা সমর সোম কোনো খবর দিলেন না। তবে রাত্রে শুধু জানলাম, তিনি পোর্টব্লেয়ার থেকে ফৌজি জাহাজ 'আই, এন, এস, গুলদার'-এ চড়ে কোকো চ্যানেলের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। এরপর তিনি খবর পাঠাবেন জাহাজ থেকেই।

পোর্টব্লেয়ারের নৌবাহিনীর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম রাত বারোটায়—'গুলদার' এখন কোথায়, 'আংরে'র কোনো খবর তাঁরা জানেন কিনা।

উত্তর এল: 'গুলদার' পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে রয়েছে। 'আংরে'র খবর আজ পাইনি। আবহাওয়া ভাল।

৫ই মার্চ। আজকের কাগজে ওদের সম্পর্কে কোনোরকম বিস্তারিত খবর বের হয় নি। সারাদিন টেলিফোন, বিভিন্ন লোকের আনাগোনা—সকলের প্রশ্ন: ওদের খবর কি? আন্দামানের প্রথম দ্বীপে ওরা নেমেছে?

তেত্রিশ দিন পরে, ওপারে প্রথম ভূখণ্ডে

সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো জবাব দিতে পারিনি। খবর এল সাতটায়। টেলেক্সে সমর সোমের ৩১৭টি শব্দের দীর্ঘ বার্তা। শেষ দুটি লাইনে তিনি জানালেন—···"The last light today (') Rowers medically examined by Navy doctor Ponakkar (') Blood pressure normal (') Quiet fit (') Wether fine (') EOM (317)".

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর, পরের দিন—বৃহস্পতিবার বিধান সভার উদ্বোধন দিবস। কাগজের অফিস একেই ব্যস্ত। তদুপরি প্রথমদিনের অধিবেশনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে। বিভিন্ন ধরণের খবর লিখতে হবে।

বিধান সভার অধিবেশনের মধ্যে কি আন্দামান-অভিযান প্রসঙ্গ ডুবে যাবে? সাত পাঁচ ভাবছি—ডাক পড়লো অ্যাসোসিয়েটেড এডিটরের ঘর থেকে।

'ডিউক-পিনাকীর খবর সেকেণ্ড লীড হবে—কালকের কাগজে

ফার্স্ট লীড বিধানসভার অধিবেশন; দ্বিতীয়টি তোমার নিউজ, তিনকলম হেডিং-এ। ওদের দুজনের ছবি চাই—যা বের হয়নি এর আগে। হ্যাঁ, আর একটা ছবি—সমুদ্রে সূর্যোদয়ের ছবি। যা ওরা মাঝদরিয়া থেকে তুলে পাঠিয়েছিল।'

আমার মাথা তখন বন্ বন্ করছে। নিউজ তো লিখলাম। কিন্তু কাল কি করে আন্দামানে যাবো! রাত তখন আটটা। দুপুরে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রেঙ্গুন হয়ে পোর্টব্লেয়ার যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছি। কিন্তু প্লেনের টিকিট তখনও যোগাড় হয়নি। অথচ পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় দমদম থেকে টেকঅফ-এর সময়। আই, এ, সিতে গিয়ে কিউ-এ দাঁড়িয়েও টিকিট পাওয়া যায়নি। যেহেতু বিদেশের মাটিতে (রেঙ্গুনে) পা দিতে হবে, সুতরাং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ছাপ মারা হেলথ সার্টিফিকেট চাই। কর্পোরেশনে ছুটলাম। তাঁরা ইঞ্জেকশন ও টীকা দিলেন। কিন্তু 'সীলমোহর' পাওয়া গেল না। সাড়ে নটায় সেটি পেলাম ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অফিস থেকে। তাও এত জিজ্ঞাসাবাদের পর যে মনে হল, ওর চাইতে আই, এ, এস, পরীক্ষায় বসলে অনেক সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে হত।

তারপর প্লেনের টিকিট নিয়ে অফিসে ফিরতে বাজল সাড়ে দশটা। ইতিমধ্যে ইঞ্জেকশন ও টীকার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১০১ ডিগ্রি জ্বর। কিন্তু সাংবাদিকদের ওসব ওজর আপত্তি চলে না। 'পরে করব' বলে কোনো কাজ ফেলে রাখলে হয় না।

বার্তা সম্পাদকের কাছ থেকে তাগাদা এল—কই তোমার কপি কোথায়? প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রীর অভিনন্দন বাণী যোগাড় কর।

প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংগ্রহে সাহায্য করেছিলেন দিল্লীর খগেন দা। রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জীকে টেলিফোন করতে তিনি অভিনন্দন জানালেন।

আগামীকালের (৬.৩.৬৯) কাগজের জন্য লিখলাম :

"কালই নির্ভয়ে দুই তরুণ ভারতীয় নাবিক দুস্তর পারাবার পার হয়ে আন্দামানের কূলে পৌঁছেছে। ঠিক এক মাস আগে ওরা যে দুর্জয় সংকল্প বুকে নিয়ে কেবলই সাহস ভরসা করে মোহনা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, বুধবার তারা দ্বীপময় আন্দামানের পর্বতশিখরে বিজয়কেতন উড়িয়েছে।"

এরই নীচে 'আংরে' থেকে তোলা সূর্যোদয়ের ছবি।

"পিনাকী আর ডিউক তখন মধ্য সমুদ্রে। ওরা আন্দামানের তীরে উপনীত হয় বুধবার (৫.৩.৬৯) সূর্যাস্তে—সব শঙ্কা, সব উৎকণ্ঠা দূর করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ভূখণ্ড ল্যাণ্ডফলে পৌঁছে এই দুই দুঃসাহসী নাবিক পাহাড়ের চূড়ায় জাতীয় পতাকা ওড়ায়। কিন্তু ল্যাণ্ডফল জনশূন্য। ওরা তারপর চলে যায় বিপরীত দিকে ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডে। ওই দ্বীপের অধিবাসীরা সহর্ষ অভিনন্দন জানালেন। ওখানে সহর জনপদের মত দামী নামী ফুল পাওয়া যায় না। তাই অভ্যর্থনা জানান, বনের পাতা ও নাম না-জানা নানা ফুল বনের লতায় গেঁথে। যাঁরা খালি হাতে এসেছিলেন দ্বীপের তীরে, তাঁদের সম্বল ছিল ভালবাসা, স্নেহ।

সমর সোম জানাচ্ছেন, সকাল আটটায় 'আই, এন, এস, গুলদারে' আমরা ওদের কাছে পৌঁছাই। ডিউক-পিনাকীর ব্লাডপ্রেসার নরম্যাল। উভয়েই খুশিতে উচ্ছ্বসিত। ওপার থেকে তেত্রিশ দিন পর ওরা এপারের ভূখণ্ডে এল।

আবহাওয়া চমৎকার। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। 'গুলদার' থেকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ডিউক-পিনাকী অবিরাম গতিতে দাঁড় টেনে চলেছে। ওরা মাঝে মাঝে বলে দিচ্ছে—ওরা ভাল আছে।"

রাত্রের খবর—অভিযাত্রীদ্বয় বিকালে ইস্টার্ন আইল্যাণ্ডে নোঙর করে

বিশ্রাম নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৬.৩.৬৯) সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। ওইদিন এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের চেয়ারম্যান মিহির সেন ওখানে পৌঁছালে পোর্টব্লেয়ার অভিমুখে এই দুই দাঁড়ি আবার দাঁড় বাওয়া শুরু করবে। রবিবারের (৯.৩.৬৯) মধ্যে ওরা পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে যাবে বলে মনে হয়।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতায় ডিউক-পিনাকীর সাফল্যের সংবাদ আসতেই সর্বত্র উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অনেকেই অভিনন্দন জানালেন। রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ডিউক পিনাকীর কাছে পাঠানো এক বাণীতে বলেছেন, ছোট নৌকো নিয়ে যে ভাবে তোমরা সমুদ্র জয় করলে, তা সত্যিই দুঃসাহসের। তোমরা মাতৃভূমির গৌরব। তোমাদের জয়ে যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হবে। তোমরা প্রমাণ করেছ, ভারতের তরুণরা পৃথিবীর অন্যদেশের তরুণদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তোমরা আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।

মিহির সেন খবর পেয়ে অভিনন্দনের সঙ্গে এক তারবার্তায় ওদের দুজনকে গোঁফ-দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন।

'গুলদার' থেকে সমর সোম আরও জানিয়েছেন, ডিউক-পিনাকীকে সংবর্ধনার জন্য আন্দামানের বহু দ্বীপ উৎসব সাজে সেজেছে। ওদের জন্য তোরণ তৈরি হয়েছে। পোর্টব্লেয়ারের পৌরসভা নাগরিক সংবর্ধনা জানাবেন। দুখানি সোনার মেডেল তৈরি করা হয়েছে। ওর উপরে খোদাই করা থাকবে 'পোর্টব্লেয়ারে নৌ-অভিযানের দুই বীর'।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওদের অভিযান সফল হয়েছে জেনে বলেছেন, ডিউক-পিনাকী 'কানোজি আংরে'র সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। তাদের এই বিপদ সংকুল অভিযানের সাফল্য ভারতের যুব মনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

রাত সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরে গোটা কয়েক পিল খেতে হল ইঞ্জেকশনের জ্বর কমাবার জন্য।

আমরা পোর্টব্লেয়ারের পথে

৬ই মারচ ঃ দিন শুরু হল ভোর রাত্রে, সাড়ে তিনটেয়। ছ'টার মধ্যে দমদমে পৌঁছাতে হবে। তাই এত ব্যস্ততা। সারা রাস্তায় ঘন কুয়াশা। ছ'টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে গিয়ে দেখি মিহির সেন ও ওঁর ক্লাবের অশোক দাশগুপ্ত এবং যুগভানু সিং দেও ওরফে জিমির লাগেজ জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি ছাড়া আরও কয়েকজন সাংবাদিক যাচ্ছেন পোর্টব্লেয়ারে। তাঁরা, অমৃতবাজার পত্রিকার অরুণ ভট্টাচার্য, যুগান্তরের ফটোগ্রাফার শ্যামল বসু এবং ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিশনের পূর্বভারতের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীপরমেশ। আই এ সি'র সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে লাগেজ দিয়ে, টিকিট দেখিয়ে রাণওয়ের দিকে যাচ্ছিলাম—লাউড স্পীকারে ঘোষণা করা হল—ভীষণ কুয়াশা, পোর্টব্লেয়ার গামী ভাইকাউন্ট দেরিতে ছাড়বে। সাড়ে সাতটার প্লেন ছাড়ল সাড়ে আটটায়।

রেঙ্গুন পৌঁছলাম এগারটার কিছু আগে। পোর্টব্লেয়ার গামী প্রত্যেক প্লেন রেঙ্গুন হয়ে যায়, আন্দামানের কোথাও প্লেনে ফুয়েলিং এর ব্যবস্থা নেই বলে। পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতা আসতে গেলেও তাই রেঙ্গুনে থামতে হয়।

রেঙ্গুনে নেমে ভেবেছিলাম, ভারতীয় হাইকমিশন অফিসের কাউকে না কাউকে দেখতে পাব। বিমান বন্দরে কাউকে পেলাম না। অথচ এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তারা ও কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা আজ রেঙ্গুন হয়ে আন্দামান যাচ্ছেন, সেকথা রেঙ্গুনের বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে ডিউক-পিনাকীর খবরের সঙ্গেই।

বিমানবন্দরের কর্মীরা ও বর্মা সরকারের অফিসাররা কৌতূহল ভরে নানা প্রশ্ন করলেন অভিযান সম্পর্কে।

আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম ভারতীয় হাইকমিশন অফিসের সঙ্গে। জনসংযোগ অফিসার, ফার্স্ট সেক্রেটারি সকলেই কেমন যেন আমতা আমতা করলেন; বললেন, 'খবরের কাগজে অভিযানের খবরটি পড়েছিলাম বটে!' বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাসের অফিসারদের সম্পর্কে প্রায়ই নানা অভিযোগ শুনেছি, রেঙ্গুনে হাতে নাতে সে প্রমাণ মিলল।

ওদের জানিয়ে দিলাম, ১১ই মার্চ ডিউক-পিনাকী রেঙ্গুন হয়ে কলকাতায় ফিরবে। এখানকার ভারতীয়দের ওইদিন বিমান বন্দরে আসতে বলবেন। উত্তর এল, 'দিল্লী থেকে বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়েব অনুমতি চাই, এখানে সামরিক শাসন, বড্ড কড়াকড়ি।'

এগারটার কিছু পরে আবার যাত্রা শুরু। পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্যাগোডার সহর, বর্মার পাহাড়, জঙ্গল, ইরাবতী নদী ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের আকাশে আমাদের ভাইকাউন্ট উড়ল। দ্রুত ছুটছে সে পোর্টব্লেয়ারের দিকে। গতি ঘণ্টায় সাড়ে তিনশ মাইল। কলকাতায় একঘণ্টা 'লেট' হয়েছে, পাইলট বললেন, এবার কিছুটা 'মেক আপ' করতে চাই। কখনও আমরা বারোশ', কখনও ষোলশ', কখনও বা আঠার শ' ফুট উপরে সাগর থেকে। জানালার পাশে বসে থলজলে ভরা বঙ্গোপসাগরকে দেখছিলাম। নীল সাগর। সামান্য হাওয়ায় যেমন পুকুরের জল কেঁপে ওঠে, ঠিক তেমনি বঙ্গোপসাগর। ককপিটে গিয়ে পাইলটের পাশে রেডিও অফিসারের আসনে বসে কথায় কথায় বললাম, সমুদ্র তাহলে শান্ত!

—শান্ত? কেমন করে বুঝলেন!

—এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

—ওই জল-কাঁপুনি মানে বেশ বড় বড় ঢেউ। হঠাৎ তিনি প্লেনটি সমুদ্র থেকে আটশ' ফুটের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রের প্রকৃতি কিছুটা উপলব্ধি করলাম। প্রচণ্ড ঢেউ বইছে—হাওয়া না থাকা অবস্থায়ও।

মাঝে মাঝে দুই একটা দ্বীপ দেখলাম, কিন্তু মাঝ দরিয়ায় কোথাও কোনো জাহাজ চোখে পড়ল না।

পৌণে একটা নাগাদ দূর থেকে পাহাড়, ঘন বনে নানা ধরণের গাছ দেখতে পেলাম। প্লেনের মধ্যেকার সেই লেখা জ্বলে উঠল—'প্লিজ ফ্যাস্‌ন ইওর সীট বেল্টস্‌।' লাউডস্পীকারে ভেসে এল—আমরা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোর্টব্লেয়ারে নামবো।

'দ্বীপান্তরে'র আন্দামানের কথা এতদিন বইয়ে, কাগজে পড়েছি, লোক মুখে শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখিনি। উপর থেকে নারকেল ও সুপুরিবাগান দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। প্লেন তখন বিমান বন্দরের উপর দিয়ে ঘুরছে। নিচে কয়েক শ' লোক, বেশ কিছু গাড়ি। উঁচু-নীচু রানওয়ে। ১টা ১০ মিনিটে প্লেনের দরজা খুলে গেল। প্রথমে নামলেন মিহির সেন। ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে চীফ্‌ কমিশনারের পক্ষে ডেপুটি চীফ কমিশনার শ্রীমালহোত্রা। তারপর স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ।

আধঘণ্টা কাটল বিমান বন্দরে লাগেজ পেতে। এর মধ্যেই পরিচয় হয়ে গেল একাধিক জনের সঙ্গে। সকলেই বাঙালী, আরও সোজাসুজি বলতে গেলে, তাঁরা বাঙাল। কেউ রয়েছেন এখানে চাকুরির সুবাদে, কেউ বা দুই তিন পুরুষ ধরে।

প্লেন থেকে বড় বড় বস্তা বোঝাই কী যেন নামানো হল, আরও বিভিন্ন জিনিষ। জাহাজে মূল ভূখণ্ড থেকে নানা জিনিষ এলেও এখানকার ব্যবসায়ীরা সপ্তাহের দুদিনে এই প্লেন সার্ভিসে অনেক অনেক উপকৃত। বস্তা বোঝাই এসেছে আলু ও পিঁয়াজ। একজন বললেন, আন্দামানে মাছ, চাল, ফল, গম ও অন্যান্য সব্জী উৎপন্ন হলেও আলু ও পিঁয়াজ চাষ হয় না।

পোর্টব্লেয়ারে আবাসিক হোটেল নেই। তাই আন্দামান প্রশাসনের স্মরণ নিতে হল। স্থির হল, আমরা সাংবাদিকরা থাকবো নেভি

অফিসের সামনে সরকারী বাংলোয়, এক্সপ্লোরাস ক্লাবের কর্মকর্তারা গেস্ট হাউসে।

বিমান বন্দর থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে যেতে হবে। গাড়িতে সব মালপত্তর তোলা হয়ে গেছে, হঠাৎ দশাসই চেহারার এক বাঙালী ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। বুঝতে অসুবিধা হল না তাম্বুলি বিলাসী এই ব্যক্তি আই এ সি'র পোর্টব্লেয়ারস্থ ভারপ্রাপ্ত অফিসার। প্রথম দেখা হতেই নিঃসঙ্কোচে বললেন,—আমি শালা বিনয় ভোস। কলকাতায় ওঁর কথা বহুবার শুনেছি, চাক্ষুস দেখে বুঝলাম মুহূর্তের মধ্যে কেমন করে তিনি সকলকে আপন করে নিতে পারেন।

গাড়িতে চড়ে প্রথমবার সকলেরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হল। উঁচু-নিচু রাস্তা। তার অর্থ কলকাতায় বৃষ্টির পরের মরণ খাদ নয়; আন্দামানের সর্বত্র এই রকম চড়াই-উৎরাই। রাস্তায় কোথাও ধুলো নেই, সর্বত্রই গাছ আর গাছ। প্রকৃতির রাজত্ব। পাহাড় ও সমতলভুমি দুই অঞ্চলের ভিন্ন আবহাওয়ার নানা গাছ যে কীভাবে পাশাপাশি অভিন্ন হয়ে বেড়ে উঠেছে, বুঝলাম না।

হ্যাঁ, বিমান বন্দরে নেমেই কলকাতা থেকে পরে আসা গরম কোট, ট্রাউজার্স খুলে ফেলতে হল। পোর্টব্লেয়ারের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় ওসব অচল। প্রমাণও পাচ্ছিলাম প্রতি মুহূর্তে। আমাদের নির্দিষ্ট আস্তানায় যাওয়ার পথে একটিও পাকা বাড়ি চোখে পড়ল না। সব কাঠের তৈরি। ছাউনি টিন, অ্যাসবেস্টসের। কাঠের বাড়িতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের অভাব, ভাল মিস্ত্রী নেই বলেই।

আমাদের নির্দিষ্ট বাংলোর দক্ষিণে রাস্তা, নেভি অফিস, আরও অনেক বাড়ি। কিন্তু পূব, পশ্চিম, উত্তরের জানালা দিয়ে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই সমুদ্র। মনে হবে—এই দ্বীপ, নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র ছাড়া জগতে আর কিছুই নেই। মাঝে মাঝে অরণ্যময় দ্বীপ। সব সময় ঝিরঝিরে হাওয়া। ফ্যানের বদলে ওই হাওয়া

স্বভাবতই স্নিগ্ধ। স্নান সেরে ডাইনিং টেবিলে বসতে ফুল স্পীডে ফ্যান চালান হল। অরুণদা কেয়ারটেকারের লোকদের বললেন, ফ্যানের হাওয়া অনেক খেয়েছি, জানালা খুলে দিন। কলকাতায় থেকে থেকে শরীরের পুরোটা ভেজাল হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে নির্ভেজাল হাওয়া ঢুকিয়ে নিয়ে যাই।

মধ্যাহ্ন ভোজে সব কিছুর আয়োজন ছিল। ভাত, তরকারী, ডাল, মাছ, মাংস। কিন্তু স্বাদে বাংলাদেশের মত নয়। কলকাতার মত কোনো মাছ পেলাম না। সবই সামুদ্রিক মাছ। তবে সার্ডিন মাছ ভাজা বহুকাল জিভে জল এনে দেবে। অঢেল অন্যান্য মাছ। সবই ভাজা, ফ্রাই। মাছের ঝাল বা ঝোল ওরা রান্না করতে জানে না। সম্ভবতঃ (ওরা দক্ষিণ ভারতীয়) বাঙালী রাঁধুনী নেই বলেই।

খাওয়ার পর গেস্ট হাউস থেকে মিহির সেন টেলিফোনে জানালেন, তিনি একটি লঞ্চে এক্সানি ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডের দিকে চলে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের নিয়ে পৃথক আর একটি লঞ্চ ছাড়বে বিকালে। সেই লঞ্চে ওয়্যারলেসের ব্যবস্থা থাকছে। সেখান থেকে পোর্টব্লেয়ার ওয়্যারলেস ষ্টেশনে খবর পাঠালে, তাঁরা তা সরাসরি কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন।

তবুও আমি ঝুঁকি নিলাম না। রেঙ্গুন বিমান বন্দর থেকে হাই কমিশন অফিসে টেলিফোন ও পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছবার খবরটুকু কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম।

টেলিগ্রাফ তথা ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে বের হয়ে আসছি, পিছন থেকে ডাকলেন এক অফিসার: "সমর সোম 'আই, এন, এস, গুলদার' থেকে আজ ভোরে খবর পাঠিয়েছেন আনন্দবাজারের জন্য, আপনি দেখতে পারেন"। সমরদা যা পাঠিয়েছিলেন: "৫ই মার্চ আমাদের সারাটা রাত কেটেছে সমুদ্রে। কোকো দ্বীপকে পিছনে ফেলে রেখে আন্তর্জাতিক দরিয়া থেকে আমরা আমাদের নিজস্ব দরিয়ায় ঢুকেছি।

'গুলদার' থেকে আমরা ল্যাণ্ডফল দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। দ্বীপটি আমাদের জাহাজ থেকে মাইল তিনেক দূরে। উল্লেখ্য হল—'আংরে'কে অনুসরণকারী জাহাজটি ডিউকের অতি চেনা। ১৯৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি 'আই, এন, এস, বিক্রান্ত'তে কাজ শুরু করেন। তারপর ১৯৬৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ৯৬৮ সালের ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজে। যেমন : 'তীর', 'কুঠার', 'ব্রহ্মপুত্র' ও 'গুলদার'। সাব-লেফটেনাণ্ট হিসাবে ডিউক 'গুলদারে' যোগ দেন এবং তারপর হন লেফটেনাণ্ট। তাই 'গুলদারে'র নাবিকদের আজ পরম আনন্দের দিন। দুঃসাহসিক কাজে ডিউকের আগ্রহ সব সময়। নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কামোরতা দ্বীপে থাকাকালে ডিউক ৪৫ টাকা দিয়ে একটি নৌকো কিনে তার নাম রাখেন 'লিটল্ গুলদার'। এখনও সেই নৌকো ভাইজাগ সেলিং ক্লাবে রয়েছে।"

আবাসে ফিরে একটা অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ল। কোনো দরজায় তালা লাগাবার ব্যবস্থা নেই। কেয়ারটেকার বললেন, প্রয়োজন হয় না। কোনো জিনিষ চুরির ভয় নেই। সারা আন্দামানে চুরির ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। ভিক্ষুক দেখতে পাবেন না। সকলেই কাজ করেন, কায়িক পরিশ্রম করেন। অলস মানুষ পাবেন না। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এখানেই আমাদের পার্থক্য।

চোরের উপদ্রব নেই আন্দামানে, ছ'দিন অবস্থান কালেই তা বুঝেছিলাম। রোজই আমরা দরজা, জানালা খুলে ঘুমোতাম। 'চুরি' প্রসঙ্গের সত্যতা যাচাই করতে, থানায় গিয়ে দুই বছরের জেনারেল ডায়েরী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটিও চুরির 'কেস' পাইনি।

অতীতের 'ভয়াবহ' আন্দামান সত্যিই অদ্ভুত লাগল। অতুল স্মৃতি সমিতির প্রধান সমর চৌধুরী ওখানে রয়েছেন দীর্ঘকাল। প্রবল প্রতিপত্তি তাঁর। কিন্তু আফশোস তাঁর, কর্মঠ বাঙালী তরুণ পাচ্ছেন

না। বললেন, মূল ভূখণ্ডে চাকুরির অভাব, এখানে অভাব চাকুরিয়ার। এখানকার স্কুলে থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেই সকলে চাকুরিতে ঢোকে। স্কুলে ভর্তির সময় বয়সও সেইভাবে হিসাব করা থাকে। সরকারী চাকুরির জন্য ১৮ বছর তো হওয়া চাই! এবং এইজন্যই এখানকার কলেজটি বসে রাত্রে। দিনে ছাত্রছাত্রী হয় না। চাকুরির শেষে ওঁরা সন্ধ্যায় কলেজে আসেন। 'বাঙালী শ্রম বিমুখ'—এ অপবাদ এখানকার অধিবাসীদের কেউ দিতে পারবেন না। শিল্পে, ব্যবসায়ে, সরকারী উঁচু পদে—সর্বত্র বাঙালী।

আর সাংবাদিক সমর সোম এখানে সব কাজের পুরোধা। তাঁর আগে আন্দামানে কেউ সংবাদপত্র প্রকাশ করেননি। সমরদার ইংরাজি সাপ্তাহিক 'আন্দামান টাইমস' আন্দামানের প্রথম ও একমাত্র সংবাদপত্র। পোর্টব্লেয়ার বেতার কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ করুন—সাহিত্য, কলা, রাজনীতি, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সব কিছুর বক্তা তিনি। কোনো ভি. আই. পি আসছেন? চীফ কমিশনারের কাছ থেকে প্রথম ডাক পড়বে তাঁর,—'একটু পরামর্শ করতে চাই মিস্টার সোম'।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে তাঁর মত বেসরকারী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কমই আছেন। অবশ্য শিল্পপতি শ্রীসমর চৌধুরীও কম যান না।

সেদিন বিকালে যেটুকু সময় পেলাম, পোর্টব্লেয়ারের এদিক ওদিক একটু ঘুরে নিলাম। শুনলাম বঙ্গোপসাগরের বুকের ভয়ঙ্কর সব জন্তুর কথা। জলে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে তারা কত পুরুষ ও নারীর ভবলীলা সাঙ্গ করেছে উদর নিবৃত্তির মাধ্যমে।

অতিথি বৎসল আন্দামানবাসীদের ডাকে প্রথম দিনেই এ দুয়ার সে দুয়ার ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তলব এল চীফ কমিশনারের দফতর থেকে, 'জাহাজ প্রস্তুত, আপনারা এক্ষুনিই জেটিতে চলে যান।'

ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডের দিকে

জেটিতে গিয়ে দেখি ডেপুটি চীফ কমিশনার মালহোত্রা আমাদের জন্য সব ব্যবস্থার তদারকি করছেন। নামে জাহাজ হলেও ওটি বড় লঞ্চ বৈ নয়। তবে ঝঞ্ঝা ও তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে জলযানটি চলতে পারে। ওয়ারলেসের বন্দোবস্ত হয়েছে আমাদের খবর পাঠাবার জন্য। কলকাতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। ওরা পোর্টব্লেয়ারে খবর পাঠাবে, সেখান থেকে খবর যাবে সরাসরি কলকাতায় বা মাদ্রাজের পথে কলকাতায়।

'এটা লঞ্চ নয় ট্যাগ', বললেন এক পুলিশ অফিসার। সেই ট্যাগে গিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিল। কলকাতার আমরা চারজন ছাড়াও পোর্টব্লেয়ার বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন প্রতিনিধি রয়েছেন। অথচ একটি কেবিনে দুটি সীট। পোর্টব্লেয়ারে এসেও স্যাণ্ডহেডসের কথা মনে পড়ল। 'গণেশ'-এ যেমন খোলা জায়গায় ক্যাম্বিসের খাটের ব্যবস্থা ছিল, এখানেও তেমনি বাইরে কিছু বিছানা। কিন্তু চেঁচামেচিতে কাজ হল। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো কেবিন খালি।

পোর্টব্লেয়ারকে পিছনে ফেলে আমরা চলেছি ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডের দিকে। সমুদ্রের জল ঝকমক করছে পোর্টব্লেয়ারের বিদ্যুৎ আলোয়। আমাদের বাঁদিকে সারি সারি দ্বীপ। ডাইনে সীমাহীন জলরাশি, ঘন অন্ধকার। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলি ঝক ঝক করছে, চাঁদও আছে। তবে আলো তত উজ্জ্বল নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে ঢেউয়ে কে বা কারা যেন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ওয়ারলেস অপারেটর বললেন, ফসফরাসের আলো।

ট্যাগ-এর পিছনের দিকে হঠাৎ 'মাছ মাছ' চিৎকার। প্রপেলারের কাছে একটি রডে কয়েকটি মোটা দড়ি বাঁধা। লম্বা দড়ি, তাতে

বঁড়শি। বঁড়শিতে অবশ্য চার থাকে না। বঁড়শির গায়ে লাল কাপড় বাঁধা। স্রোতে এই কাপড় নড়াচড়া করতে থাকে এবং মাছ 'গপ্' করে গিলে ফেলে। মাছ অর্থে আমরা সচরাচর নদী বা পুকুরে যা ধরি তা নয়—সামুদ্রিক মাছ, আকৃতি মানুষ সমান। সেদিন একটি ভোলা মাছ ধরা পড়েছিল। পরদিন রান্না হল। ভোলা মাছের ঝাল আর ভাজা। কলকাতায় বা শৈশবে পূর্ববঙ্গে ভোলা মাছের পট্কা দেখলে জিভে জল আসতো। লঞ্চের বাবুর্চিকে বলেছিলাম, ওটি ঝোলে ছেড়ে দিতে। সে আমার কথামতন কাজও করেছিল, কিন্তু রান্নার পর বহু মেহনতী করেও পট্কা চর্বন সম্ভব হয়নি।

ছাদে বসে লোমহর্ষক সব গল্প বলছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওয়ারলেস অফিসারটি। দু একটি দ্বীপের জঙ্গলে এখনও জারওয়া বা ওই ধরণের আদিম অধিবাসীরা কী ভাবে তীর দিয়ে বনবিভাগের কর্মীদের আক্রমণ করে। এই সব সভ্য মানুষরা নাকি ওদের চিরশত্রু। প্রকৃতপক্ষে হালফিলে ওই আদিম আধিবাসীদের সভ্যতার আলো দেখারার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ইংরাজরা একদা জারওয়াদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল; খুন, জখমের পথ নিয়েছিল—এখনও জারওয়ারা সে কথা ভোলে নি। এখন সংখ্যায়ও তারা অনেক কম। পোর্টব্লেয়ারে দুজন মহিলাকে দেখেছিলাম, ঠিক নিগ্রোদের মতন চেহারা। ওদের ভাষা না বাংলা, না আদিবাসী। তবে বাংলা ঘেঁষাই। জঙ্গলে যারা বাস করে, তাদের খাদ্য ফলমূল ও সামুদ্রিক মাছ। পানীয় জলের অভাব মেটাতে জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসের কাছাকাছি পুকুর বা অন্য কিছুর স্মরণাপন্ন হয়।

সারা রাত্রি লঞ্চ চলছে। কিন্তু দু দিকে দেখে মনে হল যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা। বাঁদিকে সেই দ্বীপপুঞ্জ আর জঙ্গল। ডাইনে বিশাল জলরাশি।

সূর্যোদয়ের আগেই লঞ্চের ছাদে গেলাম। বলাবাহুল্য, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

ওয়ারলেস অফিসারটির তাগাদাও কম ছিল না। চমৎকার ওই লোকটি। ফরেস্ট পুলিশ, জল পুলিশ কিসে না কাজ করেছেন। বয়স ৫৫-র উপর।

তিনি বললেন, প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ এমন অঞ্চল পৃথিবীতে কমই আছে। আন্দামান উপকূলে যে মাছ আছে, তা থেকে প্রতিবছর প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আসতে পারে। মাছের তেলও হবে অনেক। কাঠের কথা নতুন করে বলার নেই। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য : এখানে গন্ধকের পাহাড় রয়েছে। এই গন্ধকে সারা পৃথিবীর প্রয়োজন মিটতে পারে।

আন্দামান নিকোবার তাঁর নখদর্পণে।

মোহনায় সূর্যোদয় দেখেছিলাম, আজ আবার দেখলাম কালাপানির এপারে; কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু, প্রায় একমাস আগে ডিউক-পিনাকী ছিল মূল ভূখণ্ডের দিকে। আমাদের মনে তখন সতত শংকা, ওদের দাঁড় ঠেলে বিশাল জলরাশি অতিক্রম নিয়ে। তখন 'কানোজি আংরে' ও তার দুই অভিযাত্রী আমাদের কাছাকাছি ছিল। নানা চিন্তার মাঝে বিরাট সিঁদুর পিণ্ডটি হঠাৎ কখন সমুদ্রের বুক থেকে স্নান সেরে উঠে পড়েছে বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে কুয়াশা কেটে গিয়েছে। মোহনার দিকে সমুদ্রের জল এত নীল ছিল না। আন্দামানের এদিকে জল শুধু নীল নয়, গাঢ় নীল। কিন্তু জলের ভিতরে বেশ কিছুটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। লঞ্চ যেমন জল কেটে এগিয়ে চলেছে, তেমনি তারই দুই পার্শ্বে শুশুক বৃন্দ। ওরাও মিছিল করে ডিউক-পিনাকীকে অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছিল কিনা কে জানে!

রেলিং ঘেঁষে জলের ভিতরে যতদূর চোখ যায় দেখলাম, নানা ধরণের মাছ ও সাপ এবং হাঙরও ওই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে। সারেং সর্তক করে দিয়ে গেলেন—ওই জলে পড়লে আর নিস্তার নেই। মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্রের

জীবগুলি এসে কিলবিল করে ছেঁকে ধরবে। মানুষের চেয়ে ওদের প্রিয় খাদ্য দ্বিতীয়টি নেই।

দূর থেকে ধোঁয়াটে একটি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছিলাম। সারেং বললেন, ওটাই ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ড। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কিন্তু এক ঘণ্টা কেটে গেলেও দূরত্ব যেন একই রয়েছে। সঞ্জীব চন্দ্রের 'পালামৌ'-এ পাহাড়ের কথা মনে পড়ল। ইতিমধ্যে একটি জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হল না—'আই এন এস গুলদার'। সকাল দশটায় পৌঁছলাম ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি। 'গুলদার'কে স্পষ্ট দেখলাম। বাঁদিকে ল্যাণ্ডফল দ্বীপ। ডিউক-পিনাকী মূল ভূখণ্ড ছেড়ে প্রথম মাটি স্পর্শ করে ওই দ্বীপের। ডাইনে ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ডে লাইট হাউসের উপর পতাকা উড়ছে। দু একটি বাড়িও রয়েছে।

আমরা এখন কোথায় যাব,—'গুলদারে' না ইষ্টার্ণ আইল্যাণ্ডে? খবর এল 'গুলদার' থেকেই—ডিউক-পিনাকী জাহাজে নেই—উপরে রয়েছে। আমরা উতলা হয়ে পড়েছি ওদের জন্য। শুনলাম, মিহির সেন মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে এখানে এসেছেন।

লঞ্চ 'চালাতে বললাম। সারেং বললেন—অসম্ভব, লঞ্চ এই পাঁচশ' গজ দূরেই থাকবে। তীরে যেতে হবে নৌকোয় চড়ে। কারণ, জলের নিচে এখানে ডুবো পাহাড়। একটু ধাক্কা লাগলেই লঞ্চের বারোটা বেজে যাবে।

তীর থেকে নৌকো নিয়ে এলেন কয়েকজন। 'কানোজি আংরে' চরেই তোলা ছিল। কাছে গিয়ে দেখি মাস্তুলটা দুমড়ে রয়েছে। হাল ভাঙা, তিনটি মাত্র দাঁড় রয়েছে। ডুবো পাহাড়ের ধাক্কায় হালটি ভেঙে যায়। নৌকোর উপরের দিকে তিনটি ফুটো হয়েছিল, ফুটোগুলি অভিযাত্রীরাই সারিয়ে নেয়। নৌকোর মধ্যেকার জিনিষগুলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে, ওদের পোশাকও এলোমেলো হয়ে আছে। এক কোণে ডিউকের একটি পকেট ডিকস্‌নারী।

দেখলেই বোঝা যায় 'কানোজি আংরে' আর তার দুই অভিযাত্রীর উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছে।

স্পষ্ট রয়েছে গলুইয়ের দাগগুলি। দিন ঠিক রাখার জন্য লেঃ কম্যাণ্ডার রথীন দাশের নির্দেশেই ওরা দাগগুলি দেয়। গলুইয়ে আরও একটি বিষয় জলজ্বল করছে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লেখা 'কোমল'। বুঝতে অসুবিধা হল না—ডিউকের বাগদত্তার নাম। আরও একটি নাম দেখলাম—'শিলু'। পিনাকীর নিষেধ সত্ত্বেও জানাচ্ছি, ডিউকের যেমন কোমল, তেমনি পিনাকীর শিলু—শিউলি।

বালির চর পেরিয়ে, চড়াই উৎরাই আর জঙ্গলের রাস্তা অতিক্রম করে কয়েকশ' ফুট উঁচু লাইটহাউস অফিসে পৌঁছে দেখি, ওই দ্বীপের অধিবাসীরা অভিযাত্রীদ্বয়কে ঘিরে। মিহির সেন রয়েছেন, আছেন সাংবাদিক সমর সোম।

অভিযাত্রীদের সঙ্গে পুনর্মিলন

ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে দেখা হতেই জড়িয়ে ধরল। সাতাশ দিন পর দেখা ওদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে উভয়ের চুল লম্বা হয়েছে, গোঁফ-দাড়িও এতদিন কাটেনি। ফর্সা ডিউক তামাটে হয়ে গিয়েছে, পিনাকীও। কিন্তু পিনাকীর ডান হাতে একটুও শক্তি নেই। ওই হাতের আটটি পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে গিয়েছে। মাঝে ফ্লুতে ভুগেছে উভয়েই। এদিকে ডিউকের আগেই হার্নিয়া ছিল, মাঝ সমুদ্রে তা বেড়ে যায়।

মাঝ সমুদ্রের নানা খবর দিল ওরা দুজন। একদিন রাত্রে সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠল। ওরা তখন ঘুমিয়ে। গর্জন শুনে লাফিয়ে উঠে পিনাকী হামাগুড়ি দিয়ে ডিউককে ঘুম থেকে তোলে এবং দ্রুত নৌকোয় ও কোমরে দড়ি বেঁধে নেয়। তিন দিন তিন রাত্রি তারা

কখনও সমুদ্রের জলে, আবার ঝড় একটু থামলে নৌকো সোজা করে পাম্পের সাহায্যে জল ফেলে দিয়ে নৌকোর উপরে উঠেছে। আবার ঝড়, আবার প্রচণ্ড ঢেউ। আবার উল্টেছে নৌকো। নৌকোর ভিতরে জাল দিয়ে সব বাঁধা না থাকলে, বাকি দিনগুলোয় অনাহারে কাটাতে হত দুই অভিযাত্রীকে।

আমি ওদের পোশাক লক্ষ করছিলাম—গাঢ় সবুজ ট্র্যাকস্যুট রোদে, লোনা জলের আবহাওয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। একাধিক জায়গা ছিঁড়েও গিয়েছে। হাতের তালুর চামড়া নাকি পাঁচ ছয়বার উঠে গিয়েছে। ওজন কমেছে পিনাকীর ১৫ পাউণ্ড ও ২০ পাউণ্ড ডিউকের।

আবার ওরা সমুদ্র-ঝড়ের কথায় এল। গৌহাটি ও ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকম্পের জন্যই সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় ওঠে। কোনদিন বা ঢেউ উঁচু হয় ২০ ফুট। ওরা লড়াই করেছে মৃত্যুর সঙ্গে। কোথায় ওয়্যারলেস, কোথায় বা 'এস ও এস'! বাহাত্তর ঘণ্টা ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ ওদের সহায় ছিলেন না। ঝড় যখন পুরোপুরি থামল, তারপর সমুদ্র একেবারে শান্ত। কিন্তু দুজনেই জ্বরে আক্রান্ত হয়। পিনাকীর ডান হাতের পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে যায় ওই তিনদিনের বাঁচার লড়াইয়ে। দুজনের হাতেই কড়া পড়েছে। আবার যদি ঝড় ওঠে—তাই নিরাপত্তার জন্য, একে একে সব জিনিষের কিছু কিছু ফেলে দিয়ে নৌকো হাল্কা করে নিল। ফেলে দিতে হল পানীয় জলও। পরে পিনাকী জলের অভাব মেটায় সমুদ্রের জলে ওষুধ দিয়ে পানোপযোগী করে। কিন্তু দাঁড় বাওয়া তখন অসম্ভব। পিনাকী শুধু বাঁ হাতেই যা পেরেছিল। দাঁড়গুলি কয়েকটি ভেঙেও যায় ওই ঝড়ে পড়ে।

ক্লান্ত থাকলেও চরম বিপদের দিনগুলোর কথা বলতে বলতে দুজনের চোখে মুখে খুশির উচ্ছলতা। পিনাকী বলল: আপনাদের সকলের

আশীর্বাদই আমাদের আন্দামানে পৌছে দিয়েছে। প্রমাণ পেলাম ঈশ্বর আছেন। নইলে হিংস্র সাপ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের মুখ থেকে রেহাই পেলাম কেমন করে! ডিউকও বলল: ছিল ঈশ্বরের অসীম করুণা। হ্যাঁ, ওই ঝড় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও আমাদের অনেকটা পথ এগিয়ে দেয়। দাঁড় বেয়ে পাঁচ দিনেও অত পথ যাওয়া যেত না।

আমাদের সামনেই তখন কলকাতা থেকে পাঠানো ডিউক-পিনাকীর এক শুভানুধ্যায়ী সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের কড়া পাকের সন্দেশ।

ঘণ্টা দুয়েক ধরে ওরা আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিল। পিনাকী বলল, ৭ই থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নানা অসুবিধায় না পড়লে 'কানোজি আংরে' ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছে যেত। পিনাকীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডিউক বলল, প্রাণপণে খেটেছি, আজ হাতে নাতে ফল পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু মাঝে কয়েকটা দিন হতাশা আর অবসাদে কেটেছে। অবসাদে ভেঙে পড়ারও আশংকা দেখা দেয়। স্যাণ্ডহেডসের আশেপাশের প্রতিকূল জলরাশি অতিক্রম করতে বেগ পেয়েছি। ১৬ ঘণ্টা দাঁড় বেয়ে ৬ মাইলও যেতে পারিনি। এবং তারপর 'হারিয়ে গিয়েছি' ভেবে ভয়ও পেয়েছিলাম। কিন্তু বিদায় শুভেচ্ছা জানানো তীরের মানুষগুলির মুখ সামনে ভেসে উঠেছে, আমরা আবার নতুন উৎসাহে নৌকো বেয়েছি। তারপর বেশ কয়েকদিন পর অনুকূল সমুদ্র স্রোত, ইন্দোনেশিয়া ও গৌহাটির ভূমিকম্পের পরও (১৮ই ফেব্রুয়ারি নাগাদ) জোয়ার-ভাঁটার টান অনুকূল হাওয়ায় দিনে প্রায় ৪০ মাইল এগিয়ে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠি।

বঙ্গোপসাগরের প্রায় অর্ধেক পথ কতকগুলি হাঙর, শুশুক, দুটি পাখি 'কানোজি আংরে'কে অনুসরণ করছিল। তবে হাঙরগুলি রিলে পদ্ধতিতে অনুসরণ করছিল, কিছু দূর গিয়ে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়ায়। আর

পাখি? ওরা মাস্তুলে বাসাও বেঁধেছিল। রাত্রেও ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়ত না। ইচ্ছে করলে আমরা ওদের ধরে রেখে পুষতে পারতাম। কিন্তু হাত বাড়াইনি—শুশুক ও পাখি নাবিকদের কাছে শুভ।

ডায়েরি দেখে ডিউক জানাল: ২রা মার্চ সকাল সাড়ে সাতটায় তারা রেপিয়ার দ্বীপ দেখতে পায় এবং ৪০ মাইল দূরবর্তী কোকোদ্বীপের দিকে নৌকোর মুখ ঘোরায়। কিন্তু সেখানেও তাদের প্রবল পূর্ব-পশ্চিমী স্রোতের টানে বাধা পেতে হয়েছে। কোকোদ্বীপ থেকে ল্যাণ্ডফলদ্বীপ এই ৪০ মাইল জলপথের বাধা ছিল আরও কঠিন। ওইটুকু অতিক্রম করতে তাদের লাগে প্রায় দুদিন। কোকো চ্যানেলের কাছাকাছি বিক্ষুব্ধ স্রোতের সঙ্গে অভিযাত্রীরা যে সময় লড়াই করছিল, সেই সময় হঠাৎ এক ফৌজি বিমান 'কানোজি'কে দেখতে পায়, তারপর নৌবাহিনীর 'আই এন এস রণজিত' ও 'আই এন এস গুলদার' পর্যবেক্ষণের ভার নেয়। তারাই 'আংরে'কে অনুসরণ করতে থাকে।

ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডে সকলের আগে লাইট হাউসের পঁচিশ জন কর্মী বনের ফুল ও লতাপাতার মালা দিয়ে দুই অভিযাত্রীকে অভিনন্দন জানান। ছয় মাস হল ওঁরা এই দ্বীপে কাটাচ্ছেন। এই দ্বীপের সঙ্গে বহির্বিশ্বের একমাত্র যোগ পুলিশী বেতারের মাধ্যমে।

একটা নাগাদ লঞ্চে ফিরে আসতে উদ্যত, এমনি সময় সমরদা বললেন, চিরঞ্জীব, কলকাতায় খবর পাঠাতে চাও তো লিখে দাও, 'গুলদারের' ওয়ারলেস-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঝটপট সংক্ষেপে একটা ডেসপ্যাচ ওঁর হাতে দিলাম। ঠিক করলাম, উনি থাকবেন 'গুলদারেই', ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে। আর আমি লঞ্চে আগে চলে যাব পোর্টব্লেয়ারে।

দেড়টায় লঞ্চ ছাড়ল। তিনঘণ্টার মধ্যে ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ডকে বিদায় জানাতে হল। আমার মনটা কেমন কেমন করছিল। দ্বীপটাকে

ভাল করে দেখতেই পারলাম না। অমৃতবাজারের অরুণদা পিঠ চাপড়ে বললেন, চিরঞ্জীব, এই হল সাংবাদিকের জীবন। মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যাওয়ার আগে তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। এই পেশায় এসে কোনও কিছুর উপর বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছ কি মরেছ, হয়ত সেই ফাঁকে তোমার আর দুটি বড় খবর মিস হয়ে যাবে।

তবুও মন মানছিল না। বায়নাকুলারে যতক্ষণ পেরেছি, বঙ্গোপসাগরের বুকের ওই ছোট্ট সবুজ দ্বীপটিকে দেখেছি। ওখানকার মানুষগুলি কত সরল। তিনঘণ্টার মধ্যে কেমন ভাবে ওঁরা আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন! আন্দামানের বহু দ্বীপে ঘুরেছিলাম—দেখেছি সর্বত্র ওঁদের সততা। আর ক'দিন পরে যে মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাবো, সেখানে মানুষের মনে কত জটিলতা, ভাইয়ে ভাইয়ে কত হানাহানি কাটাকাটি!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি রাগ হচ্ছিল। তাঁর গান 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' বাংলা দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ওই গানটি খাঁটি শুধু আন্দামান সম্পর্কেই। এসব শুনে অরুণদা আবার বকে দিলেন: তুমি রিপোর্টার, এত ইমোশনাল কেন?

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, তারপর সন্ধ্যা। গতকাল সারারাত যে পথে এসেছিলাম, আজ আবার সেই পথে ফিরে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় সমুদ্র চিক্ চিক্ করছে। সারা আকাশ তারায় তারাময়। একটুও হাওয়া নেই। কেবল লঞ্চের গতিতে যেটুকু হাওয়া লাগছে। আমরা খালি গায়ে ছাদে বসে নানা গল্পে মশগুল। কেবল অরুণদা কেবিনে বসে টাইপ করে চলেছেন এক নাগাড়ে। কিন্তু সবই বৃথা। ওয়ারলেস অপারেটার জানিয়ে দিলেন, কোনও ডেসপ্যাচ যাবে না। ব্যাটারী কাজ করছে না। অরুণদা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। 'আজ দুদিনে কলকাতায় কোনও ডেসপ্যাচ পাঠানো হল না!'

অপারেটর অবশ্য পথ বাৎলে দিলেন। 'আর কয়েকমাইল গেলেই

ডিগলিপুর। ডিগলিপুর ঘাট থেকে মাইল পাঁচেক সড়কপথে গেলে সেখান থেকে খবর পাঠাতে পারবেন।' কিন্তু সারেং রাজি হননি। 'এই রাত্রে তীরে যাওয়া অনেক বিপদের। ডুবো পাহাড় রয়েছে।'

তাছাড়া ঘাটে নামলেও এই অন্ধকারে পাঁচ মাইল যাওয়াও দুষ্কর। তাই এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। লঞ্চ কোথাও থামল না। আমরা এগিয়ে চলেছি পোর্টব্লেয়ারের দিকে। অবিরাম সারারাত লঞ্চ চলল। ভোর হয়ে গেল পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছতে।

আজ শনিবার। ৮ই মার্চ। বাংলোয় ফিরেই চললাম টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে। সেখানে গিয়ে একেবারে থ। গতরাত্রে 'গুলদার' আমার যে ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিল তা তখনও কলকাতায় পাঠান হয় নি। সমর সোমের হাজার শব্দের দীর্ঘ ডেসপ্যাচটিও টেলিপ্রিণ্টার মেশিনের পাশে পড়ে রয়েছে। রাগ হচ্ছিল, কান্নাও পেল। লক্ষ লক্ষ পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, আর একটি লাইন খবর নেই আজকের কাগজে! বার্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্তরাই বা কি ভাবছেন কে জানে!

শুনলাম 'গুলদার' থেকে ওয়ারলেসে ডেসপ্যাচটি এসেছে আজ ভোর চারটায়। সুতরাং বাসি হয়ে গিয়েছে। দেরিতে পেয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মীরা আমার বা সমরদার খবর কলকাতায় পাঠানো সমীচিন মনে করেন নি। তাছাড়া কলকাতায় পাঠালেও আজকের কাগজে তো তা বের হত না। ওঁরা আমাদের সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষায় ছিলেন। বললাম, এগুলো পাঠিয়ে দিন। অধিকাংশ খবর তো ডিউক-পিনাকীর সঙ্গে ইণ্টারভ্যু।

খবর নিলাম, কম্যাণ্ডার দাশ কোনও সংবাদ পাঠিয়েছেন কিনা। কারণ, কলকাতা থেকে আসার আগে শুনেছিলাম উনি একটি ছোট জাহাজ (ট্যাগ) নিয়ে 'আংরে'কে অনুসরণ করবেন।

টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আমাদের গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে সেলুলার

জেলের অদূরে অ্যাবার্ডীন জেটির দিকে। রাস্তা জুড়ে তখন আবাল বৃদ্ধরাও বেরিয়ে পড়েছেন নতুন পোশাক পরে। ঠিক যেমনটি কলকাতায় পুজোর সময় দেখ যায়। সকলের লক্ষ ওই অ্যাবার্ডীন জেটি। সাড়ে নটা নাগাদ 'কানোজি আংরে' নিয়ে ডিউক-পিনাকী পোর্টব্লেয়ারের মাটি স্পর্শ করবে। ওই দুই দুঃসাহসীকে বীরোচিত অভিনন্দন জানাবার জন্য শুধু পোর্টব্লেয়ারের হাজার হাজার মানুষ নন, আশেপাশের দ্বীপগুলি থেকেও কাতারে কাতারে মানুষ এসেছেন দ্বীপময় আন্দমানের রাজধানীতে। আজ স্কুল কলেজ ছুটি, ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে সরকারী বেসরকারী সকল সংস্থায়।

আগে স্থির ছিল, দুই দাঁড়ির ওই ছোট্ট নৌকো ভিড়বে চ্যাথাম জেটিতে। কিন্তু স্বল্পপরিসর জায়গায় বিপদ ঘটতে পারে ভেবে আন্দামান প্রশাসন পূর্ব পরিকল্পনা বাতিল করেন। অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়, চ্যাথামের বদলে অ্যাবার্ডীনে।

বেলা বাড়ছে। এখন সাড়ে আটটা। কড়া রোদ্দুর। অ্যাবার্ডীন জেটির বিভিন্ন জায়গায় বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে, ভিড়ের চাপে যাতে কেউ সমুদ্রের জলে পড়ে না যান। গোটা আন্দামানের পুলিশ আনা হয়েছে জেটিতে। বিভিন্ন সংস্থার স্বেচ্ছাসেবকদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু কে কার কথা শোনেন! দূরে অদূরে বিভিন্ন সংস্থার ফেষ্টুনে লেখা, 'স্বাগতম ডিউক-পিনাকী', 'দুই বীরকে আন্দামান অভিনন্দন জানাচ্ছে', 'ডিউক-পিনাকী জিন্দাবাদ'।

আমাদের জেটিতে পৌঁছবার আগেই পোর্টব্লেয়াব থেকে সামরিক বাহিনীর কিছু নৌকো ও লঞ্চ, অসংখ্য অসামরিক নৌকো, লঞ্চ চলে গিয়েছে 'কানোজি আংরে'কে পাহারা দিয়ে আনতে।

হঠাৎ কোলাহল। 'ওই আসছে, ওরা আসছে', শব্দ হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে। জনতার বাঁধ ভাঙার উপক্রম। চাপ সহ্য করতে না পেরে কিছু লোক হাঁটু-সমান জলে নেমে দাঁড়ালেন। পুলিশ এগিয়ে

গিয়ে ওঁদের উপরে তুলে দিল, বিপদের আশংকায়। লাউডস্পীকারে এতক্ষণ রবীন্দ্র সঙ্গীত ও মিলিটারী ব্যাণ্ডের সুর ভেসে আসছিল। জনতার কোলাহলে তাও শুনতে পাচ্ছিনা। আমরা—সাংবাদিকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছি। আমি কোনরকমে আশ্রয় নিয়েছি একটি নৌকোয়। তারও এমন অবস্থা যে, যেকোন মুহূর্তে ডুবে যাবে।

দূর থেকে হঠাৎ জাহাজের ভেঁা শোনা গেল। দেখাও যাচ্ছে, বড় জাহাজ আর আশেপাশে স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকো। কিন্তু 'আংরে'কে খালি চোখে দেখা অসম্ভব। দূরবীণেই মনে হল 'কানোজি আংরে' গালিভারের পাশে লিলিপুট। বন্দরে ঢোকার মুখে ফৌজি নৌকোগুলি 'আংরে'কে আগলে পথ চিনিয়ে দিচ্ছিল। দূরে ফুলন্ত জলরাশির উপর 'গুলদার' যেন আনন্দে নাচছে। ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ড থেকে ডিউক-পিনাকীকে 'গুলদার'ই কোলে নিয়ে এসেছে, তারপর আবার তাদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক রীতিতে কিছুপথ দাঁড় বাইবার জন্য।

ওরা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। পালহীন নৌকো বেয়ে আসছে দুই দাঁড়ি ডিউক ও পিনাকী, তালে তালে দাঁড় ফেলতে ফেলতে।

পোর্টব্লেয়ারের সমুদ্রতীর জনসমুদ্র

সমুদ্রতীরে ভিড় আরও বেড়েছে। এখন সওয়া নটা। খালি চোখেই 'আংরে' ও তার অভিযাত্রীদ্বয়কে চেনা যাচ্ছে। এদিকে সমুদ্রতীর জনসমুদ্র। তাঁদের সকলের লক্ষ্য দুস্তর পারাবার পার হয়ে আসা দুই বীর ও তাদের নৌকোর দিকে।

ঠিক ৯টা ২৫ মিনিটে কূলে এসে ভিড়ল নৌকে। দীর্ঘক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান নরনারী 'বন্দেমাতরম' আর 'ডিউক-পিনাকী

জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সাগরতীর মুখরিত করে তুলেছেন। নৌকো থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙে বহু লোক জলে পড়ে গেল। তবুও হাজার হাজার মানুষের জয়ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, ব্যাণ্ডের বাজনা, লঞ্চ-জাহাজের সাইরেন আর ভোঁ ভোঁ শব্দের বিরাম নেই। কতজন যে বিজয় তিলক এঁকে দিলেন ডিউক-পিনাকীর ললাটে, তার হিসাব নেই। সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানালেন চীফ কমিশনার শ্রীবট্টালিয়া। একদল তরুণ তো দুই অভিযাত্রীকে মাথায় তুলে নাচলেন কয়েকমিনিট ধরে। আন্দামানের ইতিহাসে একসঙ্গে এতলোক কাউকে অভিনন্দন জানাতে জড়ো হয় নি। কোনও মন্ত্রীকেও এইভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়নি। সব মিলিয়ে আজকের সকালটি সত্যিই এক স্মরণীয় মুহূর্ত।

মুগ্ধ জনতার উচ্ছ্বাস, আবেগ ও আন্তরিক স্নেহবন্ধন শিথিল করে শেষ পর্যন্ত ডিউক ও পিনাকীকে চীফ কমিশনারের মোটরে তুলে দেওয়া হলে ওরা সোজা চলে যায় হাসপাতালে। সেখানেই ওদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা হবে।

আমি আর অপেক্ষা না করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অতিকষ্টে এগিয়ে গেলাম কিছু পথ। তারপর সামরিক বাহিনীর গাড়িতেই টেলিগ্রাফ অফিসের হেড কোয়ার্টারে।

এখন দশটা বেজে দশ মিনিট। টেলিপ্রিন্টারে ওদের পোর্টব্লেয়ারে পৌছবার প্রথম যে খবর দিলাম, তা কলকাতায় পৌছল এক মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু সে খবর তক্ষুনি আমাদের অফিসে বোধ হয় পৌছয় নি। কলকাতার সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে জানতে চাওয়া হল ওই মুহূর্তে—ডিউক-পিনাকী কেমন আছে! ওদেরকে আমাদের অভিনন্দন! সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম, ওরা ভাল আছে।

কলকাতার ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন কর্মীসংস্থা ও বিভিন্ন বিভাগ থেকেও অভিনন্দন বাণী এল।

ওদিকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে বলে রেখেছিলাম—কলকাতায় একটি

আর্জেণ্ট লাইন চাই। আধঘণ্টার মধ্যে হলেই চলবে। 'পি পি' দুজনের নাম ছিল, সন্তোষ কুমার ঘোষ ও অমিতাভ চৌধুরী।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম আন্দামানের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্ম-তৎপরতায়।

'চিরঞ্জীববাবু, কলকাতার সঙ্গে কথা বলুন। আধঘণ্টা লাগল না, আধ মিনিটেই পেয়েছি। তবে মিস্টার ঘোষকে পাওয়া যায় নি, মিস্টার চৌধুরী আছেন।'

কলকাতা থেকে তাঁর (অমিতাভ চৌধুরী) বুঝতে অসুবিধা হয়নি কে কথা বলছে 'দীপান্তর' থেকে। দূরে বলে একটু জোরেই কথা বলছিলাম, ওরা ৯টা ২৫ মিনিটে পৌঁছেছে। ভাল আছে। কলকাতা থেকে উনি ধমক দিলেন, অত চীৎকার করছ কেন, কান কেটে যাচ্ছে, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। একটু আস্তে বল।

পাঁচ মিনিট পরে লাইন ছেড়ে দিলাম। তখন সমরদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, 'কলকাতায় কিছু পাঠিয়েছ ?'

—একটা 'ফ্ল্যাশ' গিয়েছে। নিউজ এডিটরের সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছে।

ছুটে এলেন অরুণদা। কিছুক্ষণ পরে ডিউক-পিনাকী এবং মিহির সেন। অরুণদা দ্রুত টাইপ করছেন। সমরদা হাতে লিখছেন। তাঁর পাশে বসে আমিও দ্রুত রিপোর্ট তৈরি করছি। ওদিকে দুই অভিযাত্রী কলকাতা ও বোম্বাইয়ে রেডিও টেলিফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। পিনাকী বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। ওর মা-বাবা, ভাই-বোন আজ দার্জিলিং-এ। সে কলকাতায় ওর মাসীমার সঙ্গে কথা বলল এবং ডিউক বোম্বাইয়ে আত্মীয় পরিজন ও কোমল সচদেবের সঙ্গে। কোমলকে বলল, তুমি আগামী মঙ্গলবার (১১ই মার্চ) কলকাতায় থাকবে। নৌকোয় সাগর পার হওয়ার পর ওই দিনটি হবে আমার সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

রিপোর্ট লেখার পর দাঁড়িয়ে রয়েছি টেলিপ্রিণ্টার মেশিনের কাছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে সরাসরি মুহূর্তমধ্যে কলকাতায় খবব পৌঁছে যাচ্ছে। ও প্রান্ত থেকেও নানা খবর নেওয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পোর্টব্লেয়ারকে।

এখন সাড়ে বারোটা। টেলিগ্রাফ অফিস প্রায় খালি। আমরা কয়েকজন রিপোর্টার আর ওখানকার কিছু কর্মী অপেক্ষা করছি। কখন লাইন ঠিক হয়। কেননা, খানিক আগে পোর্টব্লেয়ার—কলকাতা লাইন 'ডাউন' হয়ে গিয়েছে। এখন কাজ হচ্ছে কেবল পোর্টব্লেয়ার—মাদ্রাজ লাইনে। কলকাতায় খবর পাঠাতে হবে ভায়া মাদ্রাজ। মাদ্রাজ-কলকাতা টেলিপ্রিণ্টার লাইনে যদি গণ্ডগোল থাকে, তাহলে? 'তাহলে কোন খবর কলকাতায় যাবে না।' একজন অপারেটর জানালেন।

—সুতরাং এখন ভায়া মাদ্রাজ পাঠাবেন না। কলকাতার লাইনটা দেখা যাক কি হয়!

অরুণদার কথা মত চুপচাপ বসে রইলাম। ওঁর ডেসপ্যাচ খানিকটা গিয়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যেও লাইন ঠিক হল না। অগত্যা মাদ্রাজের পথ ধরতেই হল। এবং বেলা দুটোর মধ্যে সব খবর কলকাতায় পৌঁছে গেল।

বিকালটা একেবারে খালি। বেড়াবার সবচেয়ে ভাল সময়। চলে গেলাম দক্ষিণ আন্দামানে—নারকেল ও সুপুরী চাষ দেখতে।

সমুদ্রের মধ্যে ও পাড়ে অসংখ্য পিল বক্স। যুদ্ধের সময় জাপানীরা ওগুলো তৈরী করেছিল। মাটির নিচে একাধিক কামানও দেখলাম। কিন্তু অবাক করেছে নারকেল ও সুপুরি। যেন ধান চাষ হচ্ছে। ডাবগুলোর আকৃতি এমন যে একটি ডাবের জল দুজনে ভাগ করে খেতে হল। আরও দক্ষিণে চলে গেলাম; বাঁধ দিয়েই চড়াই উৎরাইয়ের

আন্দামানে মাছের চাষ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা দিনরাত পরিশ্রমে ও সরকারের আনুকুল্যে জমিতে সোনা ফলাচ্ছেন। শুধু পরিশ্রমেই, ভিটেমাটি ছেড়ে আসা ওঁরা আজ বিত্তবানও।

৮-১০ কিলো ওজনের আনারস, কমলালেবুতে গাছ ভেঙে পড়েছে, কলা পেকে লাল হয়ে গিয়েছে (আন্দমানের কলার এটাই বিশেষত্ব)। কিন্তু কোথাও বেড়া নেই, নেই পাহারা। চুরির কোনও আশংকা নেই দ্বীপান্তরের রাজ্যে।

আরও দূরে চলে গেলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে রবার চাষ হচ্ছে। কলকাতার বালিগঞ্জের এক বাঙালী ভদ্রলোক কয়েকবছর আগে আন্দামান প্রশাসনের কাছ থেকে ১০০ একর জমি চেয়ে নিয়ে অর্ধেক জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করেছেন। কাঁচা রবার সরবরাহ করে তাঁর এক্ষুনি প্রতিবছর কয়েক লক্ষ টাকা লাভ হচ্ছে। পরীক্ষামূলক এই কাজে সাফল্য আসায় তিনি আরও জমি চেয়েছিলেন সরকারের কাছে। কিন্তু সরকার দেয় নি। সরকারও রবার চাষ শুরু করেনি।

ফেরার পথে দেখে এলাম বিভিন্ন অঞ্চলে লতা পাতা দিয়ে তোরণ বানানো হয়েছে। সর্বত্র বাংলায় লেখা 'ডিউক-পিনাকী স্বাগতম্'। আগামী কাল ওরা এই পথে কয়েকটি সংবর্ধনা সভায় যাবে বলে এই প্রস্তুতি।

রাত্রে গেস্ট হাউসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পিনাকী রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছে। সংবর্ধনা জানাচ্ছেন কিছু চেনা লোক। পুরোধা আনন্দবাজার পত্রিকার 'ব্যবসায়ে বাঙালী' ফিচার এবং 'লক্ষ্মীর কৃপালাভ ও বাঙালীর সাধনা' গ্রন্থের লেখক 'বিশ্বকর্মা' ওরফে সুধীন দা। সস্ত্রীক, সপৌত্র তিনি কুণ্ডু স্পেশাল আয়োজিত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রশান্ত গাঙ্গুলী ও অন্যরা। ওখান থেকে চললাম ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিনয় ভোসের অফিস কাম রেসিডেন্সে।

ভিতরে ঢুকতেই ছ ফুটেরও বেশি লম্বা এক মহিলা প্রথম কথাতেই হকচকিয়ে দিলেন—আমি এ বাড়ির মালিক; ছোকরা, তোমার নাম কি হে! (তাঁর হাতে ছোট একটি লাঠি)।

'ড্রাই' আন্দামানে বিনয়দা প্রেসের জন্য ককটেল পার্টির আয়োজন করেছিলেন। ভোসগৃহিণী বললেন, এই লাঠি কেন জানো? খেয়ে দেয়ে যাতে গড়াগড়ি না যাও তার জন্যই এটি। এ বাড়িতে যারা এসেছে, তারা হয় এর ঘা খেয়েছে দু একটি, কিংবা তার আগেই কেটে পড়েছে।

তবে আমরা তাঁর ওই যষ্টি ব্যবহারের আগেই কেটে পড়েছিলাম। হুইস্কি বা রামের নেশা সে রাত্রে কারুর হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে ভোস-বৌদির হাতের বেগুনী ও আলুর চপের কথা বহুকাল মনে থাকবে।

জিমখানা ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা

বাংলোয় ফিরতে চীফ কমিশনারের এক দূত এসে জানান দিলেন, রবি, সোম দু দিনে অন্তত গোটা পঁচিশেক অনুষ্ঠান আছে। ১০ তারিখে জিমখানা ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনা হবে। তার আগে এখানকার সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সংস্থা অতুল স্মৃতি সমিতি অভ্যর্থনা জানাবে। তবুও তারই আগে সেলুলার জেল দেখতে ভুল হল না। যেখানে নেতাজী সহ স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতারা দিন, মাস, বছর কাটিয়েছেন। জেলের কিছু অংশ ভেঙে গড়া হয়েছে। সমুদ্রতীরে চমৎকার টি বি স্যানাটোরিয়াম।

অভ্যর্থনা, সংবর্ধনা যেন ঘরে ঘরে। যেন বহুদিন পরে ওঁরা প্রিয়জনকে কাছে পেয়েছেন। ধনী দরিদ্রে ভেদ নেই, ফারাক নেই উঁচু নিচুতে। এত আতিথেয়তা কেউ কোথাও পেয়েছেন কিনা জানি না। অন্তত:

আন্দামানগামী সাংবাদিকদের ক'জনের জীবনে এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। আতিথেয়তার এমন প্রাচুর্য যে, এক বাড়ির লুচি নিয়েছি তো অন্য বাড়ি গিয়ে তরকারী, তৃতীয় বাড়ি সন্দেশ, চতুর্থ বাড়ি গিয়ে জল। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম ওই ক'দিনে।

৮, ৯ ও ১০ই মার্চ আন্দামান ছিল উৎসব মুখর। আনন্দের আতিশয্যে ভেঙে পড়েছিল ডিউক-পিনাকী ও 'কানোজি আংরে'কে কেন্দ্র করে। ১০ তারিখে জিমখানা ময়দানে নাগরিক সংবর্ধনায় পিনাকীর বাংলা ও ইংরাজি বক্তৃতায় সকলে মুগ্ধ হলেন।

আজ ১১ই মার্চ। গত রাত্রি থেকে পোর্টব্লেয়ার কেমন যেন ম্রিয়মান। ঠিক যেমনটি হয়, দুর্গাপূজোর শেষ দিন দশমীর সকালে। আজ আমরা ফিরে যাবো কলকাতায়। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের কলকাতার ম্যানেজার এস, সি, মুখার্জী ও কে, এল, এম-এর গৌর সরকার সস্ত্রীক এসেছিলেন এখানে গতকাল। ওঁরা এসেছিলেন এই দুই দুঃসাহসী তরুণকে দুটি বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে। ওঁদেরই সঙ্গে আমরা ফিরে যাচ্ছি একই ভাইকাউণ্টে।

বিদায় পোর্টব্লেয়ার

[illegible]-বার দুপুরের কিছু পরে যখন এখানকার এয়ারপোর্টে নেমেছিলাম, তখন যে দ্বীপবাসীরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আজও তাঁরা এসেছেন। আজকের চিত্র ভিন্ন। সকলেই গম্ভীর। করমর্দনে আন্তরিকতা আছে, কিন্তু তাঁরা সহর্ষ নন। নমস্কার, প্রতি-নমস্কারের মধ্যেও কেমন যেন গাম্ভীর্য। সকলেই জানি, কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরের এই দ্বীপের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু 'যেতে নাহি দিব' এখানেও অচল। তবুও পোর্টব্লেয়ার ছাড়তে মায়া হচ্ছিল।

হঠাৎ এরোপ্লেনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ভোঁসদা বললেন, আর নয়, উঠে পড়ুন। পাঁচদিন আগে আকাশ থেকে আন্দামানের যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তার কোনও পরিবর্তন নেই। পরিবর্তন শুধু আমার বা আমাদের মনের। এই ক'দিনে এমনভাবে কখনও কাউকে আপন করে নিতে পারিনি। অন্য কেউ পেরেছেন কিনা জানিনা। আন্দামানের রাস্তা, গাছ, জল, বাতাস, সর্বোপরি মানুষগুলোর তুলনা হয় না। আজ সকালে বাংলো ছেড়ে আসার আগে দুজন বেয়ারাকে বখশিস দিতে চেয়েছিলাম। দক্ষিণ ভারতের মানুষ ওরা। একজন অন্ধ্রের, একজন তামিলনাড়ুর। আশ্চর্য হইনি, লজ্জায় অবনত হয়েছি ওদের কথায়—'আমরা মাইনে পাই, টিপস্ নেব কেন?'

ওরাই প্রথম দিন বলেছিল, দরজার তালা কোথায় পাবো, তালা লাগাবারই তো কোন ব্যবস্থা নেই। ওসবের দরকার হয় না আন্দামানে। ডিউকের কথা মনে এল, 'পৃথিবীর অনেক জায়গায় গিয়েছি, আন্দামানের মত জায়গা কোথাও নেই।' এতদিনে বিশ্বাস হল ওর কথা।

রেঙ্গুনে অভিনন্দন

আবার রেঙ্গুন। আধ ঘণ্টার বিশ্রাম। বিমান থামতেই দেখি, রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছেন রেঙ্গুনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আর. ডি. কাটারি এবং দূতাবাসের পদস্থ অফিসাররা। প্রবাসী বাঙালী তথা ভারতীয়রাও এসেছেন অভ্যর্থনা জানাতে। বর্মা সরকারের পক্ষ থেকেও মাল্যভূষিত করা হল ডিউক-পিনাকীকে। ওখানকার খবরের কাগজেও দেখলাম বড় বড় হরফে ডিউক-পিনাকীর আগমন-বার্তা। রেঙ্গুনের সাংবাদিকরা দুই অভিযাত্রীকে ঘিরে ধরলেন, ছবি তুললেন।

তারপর যাত্রা শুরু কলকাতার দিকে। ঘণ্টায় সাড়ে তিনশ মাইল বেগে ছুটছে ভাইকাউন্ট। 'তবুও নির্দিষ্ট সময়ে (১১টা ৩০ মিনিটে) দমদমে পৌছান সম্ভব হবে না'—বললেন পাইলট।

রেঙ্গুনে অনেক দেরি হয়ে গেল। কলকাতায় পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বাজবে। খবর শুনে মিহিরদার মন খারাপ হয়ে গেল। 'এয়ারপোর্টে যারা আসবে, তারা ফিরে না যায়!' আমি তখন ককপিটে রেডিও অফিসারের আসনে বসে পাইলটের সঙ্গে কথা বলছি। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আমরা কোথায়?

—চট্টগ্রামের কাছ দিয়ে উড়ে যাচ্ছি।

—কলকাতার খবর কি বলতে পারেন?

তিনি তাড়াতাড়ি রিভিসার তুললেন।

আকাশ থেকে—'হ্যালো ক্যালকাটা'

'হ্যালো ক্যালকাটা' বলে আরম্ভ করলেন, 'আমরা পোর্টব্লেয়ার থেকে আসছি। ফ্লাইট নম্বর…। ডিউক-পিনাকী আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমাদের খবর কি?'

দমদম থেকে উত্তর: এয়ারপোর্টে এখন কয়েক হাজার লোক। অধিকাংশই ছাত্রছাত্রী, ওরা ডিউক-পিনাকীর জন্যই ভিড় করেছে।

১৫ মিনিট পরে আবার 'হ্যালো দমদম'। দমদমের কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে: প্রচণ্ড ভিড় দমদমে। পুলিশ ভিড় ঠেকাতে পারছে না। তোমাদের হয়ত অন্য কোথাও নামতে হতে পারে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তের খবর, তোমাদের প্লেন লেট হওয়ায় ছাত্ররা ভেবেছে যে, এয়ারপোর্ট ওদের সঠিক খবর দিচ্ছে না। ওদের ধারণা, ডিউক-পিনাকী পৌঁছে গিয়েছে, ভিড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। ছাত্ররা তাই বিভিন্ন প্লেন সার্চ করছে। রানওয়েতে হাজার হাজার তরুণ ও কিশোর।

ককপিটে বসে বেশ দেখতে পাচ্ছি নীল সমুদ্রের এলাকা ছাড়িয়ে আমরা স্থলে ঢুকে পড়েছি। আর পনের মিনিটের মধ্যে দমদমে পৌঁছে যাব। কিন্তু নামবো কোথায়?

পাইলট আবার কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

নির্দেশ এল, রাণওয়েতে ভিড় থাকলেও দমদমেই নামতে হবে। ওরা অশান্ত। ডিউক-পিনাকীকে না পেলে অঘটন ঘটে যেতে পারে। মেয়র, ক্রীড়ামন্ত্রী, এম, এল, এ-রাও ওদের শান্ত করতে পারছেন না। পুলিশ ওদের আটকাতে পারছে না। রাণওয়েতে নামার আগে দেখলাম অগণিত মানুষ। বেড়া টপকে তখনও শ'য়ে শ'য়ে ভিতরে ঢুকছেন।

দমদমেও জনসমুদ্র

১২টা ৩৫ মিনিটে আমরা দমদমের মাটি স্পর্শ করলাম। প্লেন থামতেই হাজার হাজার তরুণ ও কিশোর ছুটে এল। দরজা খুলে গেল প্লেনের। সিঁড়ি লাগান হল। ক্রীড়ামন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি উঠে এলেন, ডিউক-পিনাকীকে অভ্যর্থনা জানাতে। ডিউক-পিনাকী, মিহিরদা ও রামবাবু সিঁড়ি বেয়ে নামতে যাবেন, অমনি হুড়োহুড়ি। সিঁড়ি ভেঙে পড়ে গেলেন ওঁরা চারজন। তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লেন, জানিনা। অগণিত জনতা ওঁদের কাঁধে তুলে নিয়ে গেলেন। আমরা থ হয়ে বিমানের মধ্যে বন্দী। আধঘণ্টা পরে ভিড় কিছু কমায় একটি ক্রেন টেনে নিয়ে গেল বিমানটিকে। তারপর দড়িতে ঝুলে যখন নামলাম, তখনও জনতা হাজারে হাজারে। একঘণ্টা পরে অফিসের দিকে যাব ভাবছি, ট্রাফিক পুলিশ জানাল: ভি, আই, পি, রোড় বলুন, আর যে রাস্তাই বলুন, কোন রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়ার অবস্থা নেই। আর একজন পুলিশ অফিসার বললেন, ভিড়ের দাপটে ডিউক ও পিনাকী আলাদা আলাদা ভাবে চলে গিয়েছে। দেড় ঘণ্টা বাদে শ্যামবাজার হয়ে প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীটে অফিসে ফিরছিলাম; তখনও

রাস্তার দুধারে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে। ডিউককে নিয়ে যে গাড়ি এয়ারপোর্ট থেকে কারনানি এস্টেটে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবে নিয়ে যায়, সেই গাড়ির চালক বললেন, ইতিপূর্বে অনেক ভি, আই, পি, কে নিয়েছি এই গাড়িতে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে রুশ নেতৃদ্বয় বুলগানিন ও ক্রুশ্চফের পর দমদমে এমন ভিড় আর হয়নি। আর, রাণওয়েতে অত লোক ঢোকার ব্যাপারটি এই প্রথম।

অফিসে ফিরে শুনি ওদের সম্মানে একটায় রাইটার্স বিল্ডিংস ছুটি হয়ে গিয়েছে।

ভেবেছিলাম অভিযান শেষ। এবার একটু ছুটি পাব, কিছু বা বিশ্রাম। তা হল না।

১২ই মার্চ সকাল থেকেই আবার দুই অভিযাত্রীকে অনুসরণ করতে হবে। অবশ্য এবার জলে নয়, স্থলে। প্রতিদিন অন্তত দশটি করে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ১২ তারিখে শুরু হল রাজ্যপাল ধর্মবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে। তারপর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপনারায়ণ সিন্‌হা, মেয়র গোবিন্দ দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; বিধানসভা ভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এম, এল, এ-রা এত উৎসাহ নিয়ে ছুটে এলেন যে বিধানসভা কক্ষ প্রায় শূন্য হয়ে গেল। অতঃপর স্পীকার বিজয় ব্যানার্জি ডাকলেন। পরে স্থির হল, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ওদের বিরোচিত সংবর্ধনা জানানো হবে।

'এর চেয়ে সাগরেই ভাল ছিলাম'

ডিউক সম্ভবত হাঁফিয়ে উঠেছিল। পিনাকী বলল, চিরঞ্জীবদা, এর চেয়ে সাগরেই ভাল ছিলাম। বাড়িতে টিঁকতে পারছি না; দলে দলে লোক আসছেন। বাইরে রাস্তায় বের হলেও ছেঁকে ধরছেন।

পরদিন, চণ্ডী কার্টুন আঁকলেন ওই সাবজেক্ট নিয়ে—তার ক্যাপশান, 'এর চেয়ে সাগরেই ভাল ছিলাম।'

এখানেই শেষ নয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক থেকে খবর এল—দুই অভিযাত্রী বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে অভিযানের লোমহর্ষক কাহিনী বিবৃত করবে। সরকার থেকে সব ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রান্ত, ক্লান্ত মিহির সেনের মুখে খুশির হাসি—'সার্থক হয়েছে চিরজীব। আমি তরুণদের মনে দোলা দিতে চেয়েছিলাম, আজ তা সফল। আমার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন, মদত দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।'

আমি তাঁকে ৮ই মার্চের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় 'সার্থক অভিযান' পড়ে শোনালাম।

"অজানাকে জানিবার, অজেয়কে জয় করিবার, অপ্রাপ্যকে পাইবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালের। সত্য বলিতে কী, সে প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ, তাহার মনুষ্যত্বের উন্মেষ ও বিকাশ ওই প্রবৃত্তির বলেই। যাহা দুই চোখে পড়িতেছে তাহা দেখিয়াই যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকিত, হাতে যাহা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার বেশি যদি মানুষ না চাহিত, দৈব প্রসাদে যাহা মিলিয়াছে তাহাতেই যদি সে তৃপ্তি লাভ করিত, তাহা হইলে ইতিহাসের চাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই থামিয়া যাইত, সেকাল আর একালে কোনও প্রভেদ থাকিত না, সভ্যতার বোধন ও বিসর্জন দুইই সমান হইত। তাহা যে হয় নাই, তাহার প্রমাণ মানব সভ্যতার সুদীর্ঘ রোমাঞ্চকর ইতিহাস। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা বাহিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মানব যাত্রী চলিয়াছে সার্থকতার সন্ধানে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতলোকেও উত্তীর্ণ হইতে। সে চলা তাহার আজও শেষ হয় নাই, কবে হইবে কেহ জানে না। বুঝি বা অনন্তকাল ধরিয়াই সে চলিবে, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ কখনও বুঝি পড়িবে না।

মানুষের প্রগতির ইতিহাস কোটি কোটি অভিযাত্রীর অসাধ্যসাধনের ইতিহাস। তাহাদের সকলের নাম ইতিবৃত্ত কথা সযত্নে বুকে ধরিয়া রাখে নাই। একজনকে যদি মনে রাখিয়াছে তো লক্ষ লক্ষ জনকে ভুলিয়াছে। তাই বলিয়া বিস্মৃত সেই নূতনের পূজারীদের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। তাহাদের সাফল্যের সোপান বাহিয়াই মানব-সভ্যতা উঠিয়াছে সার্থকতার তুঙ্গ শৃঙ্গে। তাহারা ছিল বলিয়াই মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিয়াছে, শিখিয়াছে ইস্পাতের ব্যবহার, আবিষ্কার করিয়াছে চাষবাসের পদ্ধতি। সেই সামান্য ভিত্তির উপর উঠিয়াছে এ যুগের সমৃদ্ধির বিশাল ও বিচিত্র প্রাসাদ। ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রাম কিংবা কর্মচঞ্চল অশান্ত মহানগর কিছুই তৈয়ারি হইত না, যদি না মানুষ ভয়কে জয় করিয়া পদে পদে বিপদকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতিকে জয় না করিত। নদীতে সাগরে পাড়ি দিয়া, গিরি শিখরে উঠিয়া কান্তার মরু পার হইয়া দুঃসাহসীরা নূতন নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে ইতিহাসের, আর তাহার সহিত তাল রাখিয়া মানব-সভ্যতা বিজয়ের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

মানুষের দুঃসাহসের যে সীমা নাই সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে নিত্য-নূতন চমকপ্রদ ঘটনা। দীর্ঘকালের প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীতে রহস্যমণ্ডিত কোনও অঞ্চল নাই বলিলেই চলে। আফ্রিকা আর অবগুণ্ঠিতা নয়, নয় দক্ষিণ আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়া। সুমেরু-কুমেরুতে মানুষের অভিযান সফল হইয়াছে, তুষার মৌলি হিমালয়ের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে মানুষের অসমসাহসিকতা, মহাসমুদ্রের অতলে নামিয়া তাহার গোপনতার আবরণও খুলিয়া ফেলিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে মানুষের আর মন ভরিতেছে না। আজ সে পাড়ি দিয়াছে নক্ষত্রলোকে, তাহার অভিযান মহাশূন্যে। দূর হইতে চাঁদের সৌন্দর্য-প্রবাহে অবগাহন করিয়া এখন আর তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। চাঁদ ধরিবার জন্য আজ সে হাত বাড়াইয়াছে। আজ না হউক, কাল

চাঁদে গিয়া পৌঁছিবে প্রথম মানুষ। সেও শেষ নয়। মানুষের আকাঙ্খারও সীমা নাই, মহাশূন্যও অনন্ত। চাঁদের পর কি মঙ্গল? তাহার পর কি শুক্র? এ সৌর জগতের পর কি আর-এক সৌর জগৎ? 'চরৈবেতি' এ বাণী মানুষ কোনওদিন কি ভুলিবে?

বৃহতের সাধনায় মানুষ মত্ত বলিয়া ক্ষুদ্রকে কি ভুলিয়া যাইতে হইবে? তাহাকে কি অবহেলায় উপেক্ষা করিতে হইবে? হাজার-বাতি বৈদ্যুতিক আলো জনপদে জ্বালিয়াছে বলিয়া তো গ্রামের স্নিগ্ধ দীপ-শিখাটি মিথ্যা হইয়া যায় না। মহাশূন্যে অভিযান চালাইবার সুযোগ তো সকলে পাইবে না, তাই বলিয়া সাহসের পরিচয় কি আর কেহ দিতে পারিবে না? নক্ষত্রলোকে পাড়ি না দেওয়া ছাড়া কি দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর কোনও উপায় নাই? তা যদি হয় তাহা হইলে কিছুদিন পরে মহাকাশচারী হইবার যোগ্যতা আছে এমন লোক তো খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অসাধ্য সাধনের সামর্থ্য যদি অম্লান রাখিতে হয় তবে দুই-পাঁচ জন নয়, লক্ষ তরুণের মনে দুর্জয় সাহস, অসীম স্পর্ধা ও অকুতোভয়তা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নির্ভীক দুঃসাহসীর দল না বাড়াইলে মহাশূন্যে অভিযাত্রী তো মিলিবে না। নির্ভীকতা বিকাশের পথে বাধা যত অপসারিত হইবে দুঃসাহসের দিগন্ত ততই প্রসার লাভ করিবে।

যে দুইটি তরুণ তরঙ্গ সঙ্কুল বঙ্গোপসাগর একটি সামান্য নৌকায় অতিক্রম করিয়া একমাসের মধ্যে আন্দামানের কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা কেবল ভারতবর্ষের গৌরব নয়, বিশ্বেরও গর্ব। যে অসামান্য সাহস ও অপূর্ব মনোবল তাহারা দেখাইয়াছে তাহাতে বোঝা যাইতেছে তারুণ্যের অমর দীপ্তিতে তাহারা উদ্ভাসিত। তাহাদের কৃতিত্ব কোনও দিগ্বিজয়ী অভিযাত্রী অপেক্ষা কম নয়। তাহাদের সাফল্যের পরিমাপ কয় হাজার মাইল তাহারা অতিক্রম করিয়াছে—জলে, স্থলে, না অন্তরীক্ষে—তাহাতে নয়। তাহাদের কৃতিত্বের নিরিখ তাহাদের অসাধ্যসাধনের অটল

সঙ্কল্প। সে সঙ্কল্প যাহার থাকে কোনও কাজই তাহার কাছে অসাধ্য নয়। জীবন-মৃত্যু তাহাদের পায়ের ভৃত্য। চিত্ত যাহাদের চরম সঙ্কটেও ভাবনাহীন তাহারা সকল জাতিরই মাথার মণি। সমগ্র জাতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া অভিনন্দন জানাই 'কানোজি আংরে'র দুই বীর নাবিক ডিউক আর পিনাকীকে দেশের মুখ রাখিয়াছে বলিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ দিই এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের কর্মকর্তা শ্রীমিহির সেন ও তাঁহার সহযোগীদের, ভারতীয় তরুণের কাছে সম্ভাবনার এক নূতন দ্বার খুলিয়া দেওয়ার জন্য।"

* গ্রন্থকার কর্তৃক চিত্রসহ সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
* ১৭ নম্বর ছবির পাতায় উপরের ছবির ক্যাপসনে 'ল্যাণ্ডফল দ্বীপ'-এর স্থানে 'ইস্টার্ণ আইল্যাণ্ড' পড়তে হবে।